ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বামী সত্তদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতির মুখপত্র

বাসুদেব

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"

সম্পাদক—
ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এ., পি.এইচ্.ডি., বেদান্তশাস্ত্রী,
কাব্য-বেদান্তবেদান্ত-তীর্থ

যুগ্মসম্পাদক—
শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত এম্. এ.
শ্রীললিত কুমার বসু বি. এ.

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণ

সম্পাদকীয়

ভক্তি ও জ্ঞান—শ্রীনির্মলকুমার মিত্র

'ভক্তমাল'-এর ভক্তচরিত কথা

—শ্রীরামরঞ্জন গুপ্ত ৮৫

মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—শ্রীরাধাবল্লভ দে ৮৬

নিম্বার্কসম্প্রদায়—অধ্যক্ষ শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায় ৮৮

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্"—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ৯৯

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মগত অথবা গুণ কর্মগত ?

—ডঃ অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ১১

১। কুম্ভমেলায় ব্রজবিহারী শ্রীমহন্তের সাধুসেবা—

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্য—

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল

স্মৃতিচারণ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

গীতোক্ত—শ্রীভগবদ্বক্তির তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

শ্রীধর্মদাস দাস

১৩। আত্মসমালোচনা—শ্রীআশিনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৪। ধনধন্য ভরুন (গান)—শ্রীস্বর্ণেন্দুকুমার সরকার

১৫। সাময়িকী

১৬। নিম্বার্ক ব্রতোৎসবনির্ণয়

শ্রীনিম্বার্কব্রতোৎসব নির্ণয়

সন্ বাংলা ১৩৮২, চৈত্র মাস—৩০ দিন

২ চৈত্র, ১৬ মার্চ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা। দোলপূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।

৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ, বুধবার, প্রতিপদ ঘঃ ৬।৪৮।৫৭ পর্য্যন্ত। পরে দ্বিতীয়া (সূর্য্যোদয়তঃ)। শ্রীগোপালভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি।

৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি।

১১ চৈত্র, ২৬ মার্চ, শুক্রবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ, শনিবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী (দিবা ৭।৫১।৯ পর্য্যন্ত)। শ্রীরূপভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি। অপরাহ্ণ ঘঃ ৫।৫১।৩৬ গতে মহাদ্বাদশীযোগ। গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য। রাত্রিঃ ঘঃ ৯।৩৮।১৯ গতে মহামহাদ্বাদশীযোগ। গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য।

১৪ই চৈত্র, ২৮ মার্চ রবিবার, ত্রয়োদশী। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। সন্ধ্যা ৬।৩০।১১ মধ্যে বারুণীযোগ। গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য।

১৭ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ, বুধবার, শুক্লা প্রতিপদ, শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি।

২০ চৈত্র, ৩ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, শুক্লা ষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী। (ঘঃ ৭।৭।২ মধ্যে)। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি।

২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল, শুক্রবার, নবমী প্রাতঃ ৫।৪২।৫৩ পর্য্যন্ত। শ্রীশ্রীরামনবমীব্রত।

২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, রবিবার, দ্বাদশী। একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

সন বাংলা ১৩৮৩, বৈশাখ মাস - ৩১ দিন

১লা বৈশাখ, ইং ১৪ এপ্রিল ১৯৭৬, পূর্ণিমা শুক্ত নববর্ষারম্ভ। সমগ্র হইলে ৩১শে সংক্রান্তির দিন হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত-একমাস ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে করিয়া কিছু ইষ্টমন্ত্র জপান্তে শ্রীগুরু ও ইষ্টদেবের মন্ত্র ও পূজা, তুলসীবৃক্ষে জলদান, কায়, মন ও বাক্যকে সংযত করিয়া নিয়মিত সংখ্যায় ইষ্ট মন্ত্রজপ, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে খুবই কল্যাণ হয়।

১২ই বৈশাখ ২৫ এপ্রিল রবিবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

১৩ বৈশাখ, ২রা মে রবিবার, অক্ষয় তৃতীয়া ঘঃ পর্য্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, সত্যযুগাদ্যা। স্নানদানাদি যবের দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও হোম কর্ত্তব্য। অদ্য শ্রীশ্রীদেবীর মর্ত্ত্যে অবতরণ। শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা উৎসব। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারীজীর শ্রীচরণ দর্শন হয়। স্বর্ণচরণ কাটিয়া বাবা আশ্রমের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব।

২১ বৈশাখ, ৮ই মে, সোমবার, একাদশীর ব্রত উপবাস।

২৯ বৈশাখ, ১৬ই মে, রবিবার চতুর্দ্দশী ঘঃ ৯।৫।২৭ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত।

৩০ বৈশাখ ১৭ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঘঃ ১।৪৪।১ পর্য্যন্ত। বৈশাখী পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা। বুদ্ধ পূর্ণিমা।

বাসুদেব

ফাল্গুন
চৈত্র

মঙ্গলাচরণ

নমো বিজ্ঞানবীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তে বাক্তযোনয়ে॥

ভাঃ ৩।১৫।৫

—হে ভগবন্! আপনার বিবিধ জ্ঞানবল আছে, আপনি কৃপা করিয়া চতুর্ম্মুখ শরীর ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি রজোগুণাবলম্বী হইয়াছেন ও আপনিই এই বিশ্বের কারণ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

সম্পাদকীয়

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ"—মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মানুষ মনেই বদ্ধ, আবার মনেই মুক্ত। অনন্ত জন্মের বিষয়বাসনা প্রভৃতির সংস্কার মনেই সঞ্চিত থাকে। তাহাতেই মানুষ বদ্ধ হয়। আবার বিশুদ্ধ মনেই ব্রহ্মবোধ। অন্তঃকরণবৃত্তিতেই স্বীয় আত্মস্বরূপের জ্ঞান গৃহীত হয়। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তা ইত্যাহুর্মনীষিণঃ"—(১।৩।৪)—ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত জীবাত্মাই ভোক্তা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ না হইলে আত্মা ভোক্তা হন না। আবার বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই 'সবকিছুই যে ব্রহ্ম' ("সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম")—এই জ্ঞান লাভ হয়। শ্রুতিবাক্যেও ইহা বলা হইয়াছে—"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—(কঠঃ ২।১।১১)—এই জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তদতিরিক্ত যে কিছুই নাই—এই জ্ঞান মনের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। অতএব সাধকের পক্ষে এই মনের গতি প্রকৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। ভগবদ্ভজন বা সাধনা মনেরই ব্যাপার। মনেই বিষয়াসক্তি, আবার মনেই বিষয়বৈরাগ্য। সুতরাং সর্বদা মনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা, সর্বদা মনঃসমীক্ষণ সাধকের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময়ই আমরা এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখি না। যান্ত্রিকভাবে কতকগুলি বহিরঙ্গ ধর্মীয় কর্মের অনুষ্ঠান (যথা—বাহ্য পূজাপূজা, আরতি, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি) করিয়াই অনেক সময়ই আমরা তৃপ্ত থাকি, ধার্মিক বলিয়া অভিমান করি। সেই সকল ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানের সহিত মন কতটা একাত্ম বা তন্ময় হইয়াছে, সেই সকল ক্রিয়ার প্রভাব মনের উপর কতটা পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, মন কি পরিমাণে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইতেছে, মন শুদ্ধ হইতেছে কি না—এই বিষয়ে আমরা অনেক সময়ই কোন দৃষ্টি দেই না। ফলে মনের সহিত যোগ না থাকায় বহু দীর্ঘকাল সেই সকল ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াও আমরা বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাই না, মনেরও কোন স্থায়ী পরিবর্তন হয় না। অবশ্য ব্রতোপবাস, পূজা, জপ, শাস্ত্রপাঠ, প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের যে প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা বলিতেছি না। সেই সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য, তবে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের অবিদ্যাদি "ক্লেশ" বা মালিন্যের নাশের জন্যই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। চিত্তের শুদ্ধিসম্পাদনেই ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য। কিন্তু চিত্তের বা মনের সহিত যোগ না থাকিলে, বিক্ষিপ্ত মনে কেবলমাত্র বাহ্যিক নিয়ম রক্ষার জন্য "দায়সারা গোছের" ভাবে যান্ত্রিকভাবে (mechanically) সেই সকল ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। এই জন্যই দেখা যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পূজা, জপ, ব্রতোপবাসাদি ধর্মীয়কার্য করিয়াও মনের কোন বিশেষ পরিবর্তন হইতেছে না। কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু, ঘৃণা লজ্জাদি পাশ, বিষয়াসক্তি, অহঙ্কার, মমত্বাভিমান প্রভৃতি সকল দোষই মনে পূর্ববৎই সমান থাকিয়া যায়। এইজন্যই বলিতেছিলাম—মনের প্রতি লক্ষ্য রাখা, "মনঃসমীক্ষণ" করা সাধকের একান্ত কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে—মনেই লিপ্ততা, মনেই নির্লিপ্ততা, মনেই ভোগ, মনেই ত্যাগ, মনেই সংসার, মনেই সংসারত্যাগ—সকলই মনেরই ব্যাপার। কারণ আত্মা তো স্বরূপতঃ নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত।

এই প্রসঙ্গে গোপালতাপনী উপনিষদের একটি কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে বর্ণিত আছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সারারাত্রি ব্রজগোপীগণের সহিত বিহার করিলেন। রাত্রি প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে যমুনার অপর পারে

ক্ষিত দুর্ব্বাশা ঋষিকে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিবার জন্য দধি-দুগ্ধাদি লইয়া যমুনার অপর পারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন করিলেন—'হে কৃষ্ণ! আমরা কিরূপে এই অগাধসলিলা বিস্তীর্ণ যমুনানদী পার হইব?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে গোপীগণ! তোমরা যমুনানদীর নিকট গিয়া বল 'হে যমুনে! যদি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্মচারী হন তবে তুমি আমাদিগকে পথ প্রদান কর। তাহা হইলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবে।" তখন গোপীগণ যমুনার নিকট গিয়া সেইরূপ বলিলে যমুনার জল সরিয়া গিয়া তাহাদিগকে পথ প্রদান করিল। অতঃপর বিস্মিত হইয়া গোপীগণ যমুনার পরপারে গমন করিয়া দুর্ব্বাশা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দধিদুগ্ধাদির দ্বারা তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে ঋষি দুর্ব্বাশা গোপীগণকে যাইবার অনুমতি দিলে গোপীগণ তাঁহাকে বলিলেন—'হে ঋষিবর! আমরা কিরূপে এই বিশাল যমুনা নদী পার হইব?" তখন দুর্ব্বাশা ঋষি বলিলেন—"তোমরা যমুনার নিকট গিয়া বল যে ঋষি দুর্ব্বাশা যদি নিরাহারী হইয়া থাকেন তবে তাঁহার আদেশে তুমি আমাদিগকে পথ প্রদান কর। তাহা হইলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবে।" তখন তাঁহার কথায় গোপীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা দুর্ব্বাশা ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন—"আকণ্ঠভোজনকারী দুর্ব্বাশা কিরূপে "নিরাহারী" হইতে পারেন, বা সারারাত্রি ব্রজগোপীগণের সহিত বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে "পূর্ণ ব্রহ্মচারী" হইতে পারেন? আমরা এই রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া এই রহস্য আমাদের নিকট ব্যক্ত করুন।" তখন ঋষি দুর্ব্বাশা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে অতি সংক্ষিপ্তভাবে যে কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা সাধক মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবান্ দুর্ব্বাশা ঋষি বলিয়াছিলেন—"শব্দবান্ আকাশঃ" (গোপাল উঃ তাপনী মন্ত্র ১২)। অর্থাৎ আকাশ শব্দবিশিষ্ট। কথাটির তাৎপর্য্য এই যে শব্দ আকাশে থাকিলেও আকাশ শব্দ হইতে ভিন্ন. আকাশ তাহাতে লিপ্ত হয় না। আকাশ নিত্য অসঙ্গ। সেইরূপ আত্মাও দেহেন্দ্রিয়াদি ও ভোগ্যবিষয়সমূহ হইতে ভিন্ন। আত্মা স্বরূপতঃ সেই সকল বিষয়সমূহ হইতে নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ ("অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ)"। অতএব ভোগ্য বিষয় ইন্দ্রিয় ও মন গ্রহণ করিলেও আত্মা স্বস্বরূপে তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির মন বিষয়-ভোগাদিতে লিপ্ত হয় না, নির্লিপ্ত থাকে। অতএব তাঁহার ভোক্তৃত্বাভিমানও হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—"শব্দা-কাশাভ্যাং ভিন্নস্তিষ্ঠাকাশে তিষ্ঠতি, স হ্যাকাশস্য ন বেদ, ন হ্যাত্মাহহং কথং ভোক্তা ভবামি স্পর্শবান্ বায়ুঃ স্পর্শবায়ুভ্যাং ভিন্নস্তিষ্ঠন্ বায়ৌ তিষ্ঠতি, বায়ুর্ন বেদ তং হি স হ্যাত্মাহহং কথং ভোক্তা ভবামি। ইত্যাদি।"—(গোঃ উঃ তাপনী-১৩)—অর্থাৎ, শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন আত্মা সেই আকাশেই (হৃদয়াকাশেই) বর্ত্তমান। কিন্তু সেই আকাশ তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিতে পারে না। সেই নির্লিপ্ত ও সকল বস্তু হইতে ভিন্ন আত্মাই আমি। অতএব সেই আমি কিরূপে ভোক্তা হইব? এইরূপ বায়ু স্পর্শগুণ-যুক্ত, কিন্তু আত্মা সেই বায়ু ও স্পর্শগুণ হইতে ভিন্ন এবং সেই বায়ুমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার প্রবর্ত্তক হয়েন। কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানিতে পারে না। সেই নির্লিপ্ত আত্মাই আমি। অতএব আমি কিরূপে ভোক্তা হইব? ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতিবাক্যে বলা হইল যে আত্মা স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত। বিষয়ভোগে তাঁহার লিপ্ততা বা ভোক্তৃত্বাভিমান অজ্ঞানবশেই হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী পুরুষের মন-বুদ্ধি ভোগাদিতে লিপ্ত হয় না, সুতরাং ভোক্তৃত্বাভিমানও তাঁহার হয় না। এই জন্যই আত্মজ্ঞানী ঋষি দুর্ব্বাশা আহার করিয়াও নিজেকে নিরাহারী বলিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত উদাসীন দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রজগোপীগণের সহিত বিহার করিয়াও নিজেকে পূর্ণব্রহ্মচারী বলিয়াছেন। গীতাবাক্যেও এইরূপ কথা বলা হইয়াছে :—"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রা-বস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥" (১৩।৩২); তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ। গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে। (৩।২৮); "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (৩।২৭); "উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো

ন বিচালয়তে। গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।" (১৪।২৩); "যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাঽপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।" (১৮।১৭) ইত্যাদি। অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ববশতঃ আকাশ সর্ব্বগত হইয়া যেরূপ কোথায়ও লিপ্ত হয় না, সর্ব্বত্র অবস্থিত আত্মাও সেইরূপ দেহে লিপ্ত হয় না। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণ অর্থাৎ গুণ ও তাহার কার্য্য কর্ম্মসমূহ হইতে আত্মা পৃথক্—এইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি মনে করেন যে গুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের প্রতি বৃত্তিসম্পন্ন হইতেছে, আত্মা তৎসমস্ত হইতে পৃথক্। এইরূপ মনে করিয়া তিনি কখনও কর্ম্মে আসক্ত বা লিপ্ত হন না।...অহংকারের দ্বারা যাহাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইয়াছে তাহারাই "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে। উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না, গুণই কর্ম্মে বৃত্তিযুক্ত হইতেছে এইরূপ ধারণা করিয়া যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, বিচলিত হন না, (তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন)।..."আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহংকৃতভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত বা লিপ্ত হয়না, সেই ব্যক্তি এই সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও কাহাকেও হনন করেন না এবং এই কর্ম্মের ফলেও তিনি আবদ্ধ হন না।...।

অতএব অজ্ঞানী ব্যক্তির অবিশুদ্ধ মনই বিষয়ে ও কর্ম্মে লিপ্ত হয় ও স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমান করে। গোপাল তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন "ইদং হি মনস্তেবেবং হি মন্যতে" (গোঃ উঃ ১৪)- দেহমধ্যস্থ মনই এইরূপ মনে করে, অর্থাৎ 'আমি স্বতন্ত্রকর্ত্তা-ভোক্তা'—এইরূপ অনুভব মনই করে আত্মা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সুস্পষ্টভাবে মনই যে সংসারবন্ধের কারণ তাহা বলিতেছেন, যথা—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ।"

ভাগঃ ১১।২৩।৪২

"মনঃ সৃজতে বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ।

ভাগঃ ১২।৫।৬

অর্থাৎ—এই জনবর্গ আমার সুখদুঃখের কারণ নহে। দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল—ইহারাও আমার সুখদুঃখের কারণ নহে। পণ্ডিতগণ মনকেই সুখদুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর এই মনদ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হয়। ...মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, এবং আত্মসম্বন্ধীয় দেহ ও উৎপন্ন কর্ম্মসকলকে সৃষ্টি করে। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি সেই মনকে সৃজন করে এবং তাহা হইতেই (সেই মন হইতেই) জীবের সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতে জানা যায় যে মনই সংসার কারণ। জীব অজ্ঞানভাববশতঃ সেই মনকে আত্ম-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাকৃতিক গুণসমূহে আসক্ত হয় ও গুণসঙ্গবশতঃ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সাধনার দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করেন। অতএব এই মনই সংসারের ও মোক্ষের কারণ। এই মনের প্রতি সাধকের বিশেষ দৃষ্টি প্রধান আবশ্যক। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে মনকে নির্লিপ্ত রাখার অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহাই সাধন। মহাপুরুষগণের উক্তি :— "সদা অলগ, রহনা" সমস্ত বিষয় হইতে নিজের মনকে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত রাখ, পৃথক্ রাখ—নিজেকে কোন বিষয়ের সহিত লিপ্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিও না। কারণ আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি সকল বিষয় হইতে পৃথক্ নিত্য পদার্থ—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা ও ধারণা দরকার।

"অবিদ্যারূপ ল্যাজ খ'সে গেলে মানুষ মুক্ত হয়।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভক্তি ও জ্ঞান

—শ্রীনির্ম্মল কুমার মিত্র

যে ভক্তি ও জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্য ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি পাইতে জন্ম-মৃত্যু পারে যাইতে সক্ষম হয়, সেই ভক্তি ও জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয়-আলোচনার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ঈশ্বর স্বীয় পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত আবার যুগপৎ তদতীত—এই তত্ত্ব জ্ঞানরূপা পরা ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন রূপে জানা যায় না। ঈশ্বর বহু উপাধি ধারণ করিয়া এক হইয়াও বহুরূপে ভাসিতেছেন, এক থাকিয়াও একই মুহূর্ত্তে বহুরূপে লীলা করিতেছেন, আবার সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আপন শান্ত অদ্বিতীয় স্বরূপেও প্রকাশিত রহিয়াছেন।—এই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত স্বরূপে তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, চলন রহিত, গুণাতীত, আপন ভাবে আপনি অবস্থিত তুরীয় ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব জ্ঞানরূপা পরাভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না অর্থাৎ জ্ঞান লক্ষণা পরাভক্তি দ্বারা ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা যায়। "তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽবিজানাতি।" নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তি (উপাসনা) দ্বারা তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইয়া উঠে যখন দেখা যায় নিজেদের ভক্তিমার্গী বলিয়া পরিচয় দাতা অনেককে জ্ঞান, নির্ব্বাণ অথবা মুক্তি-শব্দ শুনিয়া নাক সিটকাইতে দেখা যায়। কিন্তু যে নির্ব্বাণমুক্তিকে সনাতন বেদশাস্ত্র "ব্রহ্মলোক-মভিসম্পদ্যতে" (ছাঃ, ৪।১৫।১), "তমেবমাত্মানমুপতত্ত্বমেতি" (ছাঃ, ৮।৬।৬, কঠঃ, ২।৩।১৭), "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ (বৃহঃ ৬।২।১৫), "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছাঃ, ৮।১৫।১), ইত্যাদি বহুবাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে নির্ব্বাণ মুক্তিকে মহর্ষিগণ "তমেতমাত্মবিদোবিদিত্বাঽমৃতাভবন্তি" (বৃহঃ ৪।৪।১৫), "অত ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তি-রত্যন্ত পুরুষার্থঃ" (সাংখ্য)সূত্র), "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র), ইত্যাদি সূত্র সমূহে সুদৃঢ়রূপে সমর্থন করিয়াছেন, "অতন্ত পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" বলিয়া যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও যাহাকে পরম চরম ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষার্থ "নির্ব্বাণ-মুক্তির" নাম শুনিয়া যাহারা নাক সিটকায়, তাহাদিগকে "বৈদিক" কিরূপে বলা যাইতে পারে? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, প্রকৃতিখণ্ড, অধ্যায়ে বেদব্যাস বলিয়াছেন—শ্রুতি কথিত মুক্তি দুই প্রকারের—প্রথম হরি-ভক্তি-রূপা আর দ্বিতীয় নির্ব্বাণরূপা। "মুক্তির দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুত্যুক্তা সকলশ্রুতা। নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তি প্রদা চ যা।" বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিস্বরূপ মুক্তি আর অপর সাধুগণ নির্ব্বাণরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন। "হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ। অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ।"—এ স্থলে মহর্ষি বেদব্যাস হরিভক্তিকে মুক্তি বলিয়া ভক্তকেও মুক্ত বলিয়াছেন। অতঃ আর্য্যমতে 'মুক্তি' শব্দ শ্রবণ মাত্রই ভক্ত-হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত নহে। এই কারণে 'হরিভক্তিবিলাসে' নিষ্কলা ভক্তিকে মুক্তি বলিয়া ঐরূপ ভক্তকে মুক্ত বলা হইয়াছে "নিষ্কলা যস্যি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তি জনার্দ্দন! মুক্তাস্তব এব ভক্তাস্তব বিক্রোর্যতো হরেঃ। (১০।২৩)। বেদ স্বয়ং বলিতেছেন—"নমস্তে বহুরূপায় বিশ্বরে পরমাত্মনে স্বাহা।" —অহো! আপনি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা হইয়াও ভক্তিধ্যানে বহুরূপে প্রকট হন! আপনাকে নমস্কার। আপনার উদ্দেশ্যে আমি "স্বাহা" বলিয়া বস্তুদানমুখে আত্মদান করিতেছি। বেদব্যাস "অধ্যাত্ম রামায়ণে" এই রহস্য অতি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে

ভগবানজঃ"—(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২৫)। যিনি অজ (নিত্য-পরব্রহ্ম), তিনি ভক্তধ্যানে বস্তুরূপে প্রকট হন। তাঁহার যে অমৃতস্বরূপ, ইহা ত নিঃসন্দেহ। সুতরাং "তাঁহাকে পান" আর "রসস্বরূপের উপলব্ধি" একই কথা।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" শাণ্ডিল্য ঋষি প্রোক্ত এই ভক্তি বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, কারণ "পরানুরক্তিঃ" জ্ঞান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভক্তিবাদী শ্রীরামানুজও "শেষুষী ভক্তিরপি" বলিয়া ভক্তিকেই জ্ঞান-বিশেষই মানিয়াছেন। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময় দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্" (নারদভক্তিসূত্র, ৫১২)। সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি উক্ত সূত্র দ্বারা "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন, ৩) এই উপনিষদ প্রতিপাদ্য "অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্ম" কেই লক্ষ্য করিয়াছেন প্রেম স্বরূপ হওয়াতে তাদৃশ 'ব্রহ্ম'কেই অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ 'দত্তাত্রেয়' রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে "আন্বীক্ষিকী" (ব্রহ্মবিদ্যা) বিদ্যার দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন। "আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্" (ভাঃ, ১১।৩।১১)। আবার দেবর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতির সহস্র পুত্রকে মোক্ষ-প্রতিপাদক অতি উত্তম সাংখ্যজ্ঞান পড়াইয়াছিলেন—"সহস্রসংখ্যান্ সম্ভূতান্ দক্ষপুত্রাংশ্চ নারদঃ। মোক্ষমধ্যা-পয়ামাস সাংখ্যজ্ঞানমনুত্তমম্।"—মহাভারত আদি পর্ব্ব, ৭৫।২। কিন্তু আধুনিক অনেক ভক্ত মোক্ষ অথবা মুক্তি নাম শুনিলে ভয়ভীত হইয়া উঠেন, আর "মুক্তেরপাতি দুর্ম্ভা" ইত্যাদি বচন বলে মুক্তিকে ভক্তি অপেক্ষা হীন বলিয়া থাকেন, পরন্তু "ভক্তিসূত্র" "নারদপঞ্চরাত্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ "রসসংস্পর্শবিহীন, 'অ-ন্যায়ামৃত' 'সাংখ্যজ্ঞানের' অধ্যাপন দ্বারা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, আর মহর্ষি বেদব্যাস মোক্ষপ্রতিপাদক সেই সাংখ্যজ্ঞানকে "অনুত্তমম্" (যাহা অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কিছু নাই) বলিয়াছেন। আবার মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ করেন। (ভাঃ ৩য় স্কন্ধ)। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায় গুরু সনৎকুমারের নিকট ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন—'সোঽহং ভগবো! মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ,—তস্মা ভগবান্দো-কস্য পারং তারয়তু ইতি' অর্থাৎ আমি মন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ব বিদ্যাই জানি, পরন্তু আমার আত্মজ্ঞান না থাকাতে শোক সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি; হে ভগবন! আত্মজ্ঞান দান করিয়া আমাকে শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন। অতঃপর শ্রীসনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভূমাবিদ্যারূপ ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। যাঁহাকে ভক্তির অবতার বলিয়া আধুনিক ভক্তগণ প্রচার করেন, সেই চৈতন্যদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন — শাস্ত্রযুক্তি—সুদৃঢ় নিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তমাধিকারী সে তারে এ সংসার॥' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২)। এখানে 'শাস্ত্র-যুক্তি-সুদৃঢ়' শব্দে শ্রুতি কথিত শ্রুতশ্রবণ ও শ্রুতমনন ব্যক্তিকেই 'উত্তমাধিকারী' বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মতেও ভক্তের পক্ষে শ্রবণ, মনন প্রভৃতি উপনিষদুক্ত সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে।

সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ সংসারের আদি বৈষ্ণব। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ধৃতরাষ্ট্র-প্রজাগর-পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মোহমুগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি জ্ঞানমার্গের উপদেশ ব্রহ্মর্ষি সনৎসুজাত দিয়াছেন। শিবাবতার জ্ঞানবাদী আচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর তাহার ভাষ্য করিয়াছেন। যদি জ্ঞানপথ সর্ব্বথা ভক্তিশূন্য নীরস হইত, তাহা হইলে কি আদিভক্ত বিষ্ণুপূজাচরণ মহর্ষিগণ জ্ঞানের উপদেশ করিতেন? তাঁহারা কিন্তু আধুনিক ভক্তের মত 'নির্ব্বাণ নিষ্ফলমের রসানভিজ্ঞা শুষ্কজনাঃ' বলিয়া নির্ব্বাণের উপেক্ষা না করিয়া তাহার বিশেষ আদর করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তি ও জ্ঞান সাপেক্ষই। যাহার বিষয়ে কোন জ্ঞানই নাই, তাহার ভক্তি কিরূপে করা যায়? 'দেবে পরিচয়ো নাস্তি বৃথা পূজা কথং ভবেৎ?' এই কারণে মহামন্ত্র গায়ত্রীতে প্রথমেই জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে—'বিদ্মহে' (আমরা তাঁহাকে জানি), এই হেতু আমরা তাঁহার ধ্যান করিতেছি 'ধীমহি'। এই ভাবে মহর্ষি ব্যাসদেবও ভাগবতে প্রথম শ্লোকেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', তেনব্রহ্মহৃদা' ইত্যাদি ভাষায় ভাগবত প্রতিপাদ্য দেবতার স্বরূপ জ্ঞান করাইয়া পরে 'সত্যং পরং ধীমহি' বলিয়া দেবতাকে আরাধন করিয়াছেন।

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই ঈশ্বররস আস্বাদন করেন অর্থাৎ ভক্ত যে ঈশ্বররস আস্বাদন করেন, জ্ঞানীও সেই ঈশ্বর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন নিখিল রস আস্বাদনের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এক রসের প্রাপ্তি হইতে পারে না। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানা রস আস্বাদনের অভাবই এক রস প্রাপ্তি। এই এক রসই ঈশ্বররস। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত উহাদের রাজা মন যখন পৃথক্ পৃথক্ রস আস্বাদন ত্যাগ করিয়া একেরই প্রতি ধাবিত হয়, যখন একেই ডুবিয়া থাকে, মাত্র তখনই একরস লাভ হয়। ইহাই ঈশ্বর-রস। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই নানা রসের অভাবরূপ একরস স্বরূপ পরম রস লাভার্থ ব্যাকুল থাকেন। শুদ্ধবোধরূপ একরসে ইতর বিশেষ হইতে পারে না। সুতরাং ভক্তি কখনই জ্ঞানহীন থাকিতে পারে না সেইরূপ জ্ঞানও কখন ভক্তিহীন থাকিতে পারে না—'যদীশ্বররসো ভক্তস্তদীশ্বররসো বুধঃ'। তত্ত্বানুভব ভিন্ন শত মুক্তিতেও কখন মুক্তি হইতে পারে না। আর ভক্তি ভিন্ন শত উপায়েও কখন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না—"ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরপি মুক্তিশতৈরপি তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাম্নাপায় শতৈরপি"।

অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। মুক্তি কোন বিভীষিকাময় বস্তু নয়। অজ্ঞান হইতে—'আমি আমার' রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে কোন্ ভক্ত অথবা জ্ঞানী চাহেন না? জ্ঞান লাভ ভিন্ন অজ্ঞান কিরূপে নষ্ট হইবে? আর ঈশ্বর-স্মরণ-রূপ ভক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞানের হাত হইতে অর্থাৎ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত কিরূপে হওয়া যাইবে? এইজন্য বলা হইয়াছে—প্রথমে ভক্তি, পরে জ্ঞান আর অন্তে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম—'ভক্তি র্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ'। অতএব জ্ঞানের ছেদ করিয়া যে ভক্তি করা হয়, সে আবার কেমন ভক্তি?

কোন কোন আধুনিক জ্ঞানপন্থিক বলেন, ভক্তির প্রয়োজনই নাই, 'দেহ মিথ্যা', 'জগৎ মিথ্যা' এইভাবের বিচার দ্বারাই জ্ঞানোদয় হইবে। এই সম্বন্ধে বলা যায় যে 'দেহ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা' এইরূপ অনুভব ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্য কখন লাভ করিতে পারে না। কর্ম, বাক্য ও ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতে যখন ঈশ্বর কৃপাপূর্ব্বক মনুষ্যের মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের ভিতর ডুবাইয়া দেন, তখনই মনুষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে, তিনিই বিচার রূপ স্ফুরণ জাগাইয়া জানাইয়া দেন ঈশ্বর কে, ভক্তই বা কে, আর জ্ঞানীই বা কে। ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সংসার হইতে মুক্ত হন, তিনি জ্ঞানী আর সংসার হইতে বিরক্ত হইয়া কেবল শ্রীহরি প্রাপ্তির নিমিত্ত যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, যিনি প্রথমে স্বভাববশে জ্ঞানপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভক্তি প্রভাবে পুনঃ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি বিদেহমুক্তি, বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাহাকে 'ভক্ত' বলা হয়। বৈরাগ্য, ভক্তি, অপরোক্ষানুভূতি ও মুক্তি এই চারি অবস্থা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমানরূপে হয়। তথাপি সংস্কার ও প্রবৃত্তির ভেদে তাঁহাদের নামের ভেদ হইয়া থাকে জ্ঞানীর পক্ষে মুক্তিই মুখ্যফল, ভক্তি মুক্তির সাধন আর ভক্তের পক্ষে ভক্তিই মুখ্য, মুক্তি, উহার আনুষঙ্গিক ফল ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥'—মোক্ষ প্রাপ্তির যত প্রকার সাধন আছে তাহাদের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতের সমস্ত বস্তুর ও নিজের যাহা স্বরূপ, তাহার অনুসন্ধানই 'ভক্তি' নামে কথিত।

যিনি সর্ব্বানুস্যূত দেবতা, চেতনা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী আকাশবৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ, তিনি নিখিল বস্তু সমূহেরও স্বরূপ। এই স্বরূপের অনুসন্ধান না করিলে সেই ঈশানের (দেবতার) সহিত পরিচয় কিরূপে সম্ভব? এই স্বরূপ প্রাপ্তির উদার কর্ত্তা তিনিই, যিনি স্বরূপকে জানিয়াছেন ও স্বয়ং তাহাতে স্থিতি লাভও করিয়াছেন। তিনি যতকাল পর্য্যন্ত ভ্রান্ত জীবের বিশেষ আগ্রহে করুণাপরবশ হইয়া অভ্রান্ত স্বরূপ স্থিতির পথ না নির্দ্দেশ করেন, তাবৎ আত্মৌপম্যিকী বিদ্যা বা আত্মবিদ্যা লাভ করা যাইতে পারে না। এই কারণে ভব-সাগর পারের নিপুণ কাণ্ডারীর (আচার্য্যের করুণাঘন) সঙ্কেত আদেশানুসারে সাধন আবশ্যক, এবং শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রতিজ্ঞা

করিয়া আচরণও আবশ্যক।

মায়া অঘটন-ঘটন পটীয়সী। ইহাকেই ভগবান্ 'মম মায়া দুরত্যয়া' বলিয়াছেন। মানুষ নিজ সামর্থ্যে কখনই বিভীষিকাময় আবর্ত ও গহ্বর সঙ্কুল এই মায়ার নাগ পাশ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি নিত্যা। ইঁহার স্বরূপ যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন সেই অপ্রাকৃত শক্তিবরের প্রভাবে সৃষ্ট তাঁহারই লীলা-বিলাস সঙ্গীনী-রঙ্গিনী এই মায়াদেবী অচিন্ত্যা। ইঁহার রূপ গতি-লীলা সমস্তই দৈবশক্তি সম্ভূতা। তাই করুণার মূর্ত প্রতীক শ্রীভগবান্ গীতিতে বলিলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" বহু লাগা খাইয়া, বিশেষ বিপন্ন হইয়া, অশেষ লাঞ্ছনা ভুগিয়া যখন বিবেকী মানুষ শ্রীগুরুকৃপায় সেই মায়াধীশেরই শরণাপন্ন হয়, তখনই মাত্র তাঁহারই কৃপা-কটাক্ষ-ইঙ্গিতে জীবের শিরোপরি দেবীর ত্রিগুণ ঘাদুয়া ঘোরান উদ্যম লীলা-ভঙ্গ। যাহা আপাততঃ অতি শীতল ও মনোহর মনে হইলেও বস্তুতঃ যাহা অত্যন্ত উষ্ণ, অস্থি-মজ্জা জ্বালাকর, আবার সত্যবৎ প্রতীত হইলেও যাহা আদ্যন্ত মিথ্যা ও অন্তে বীভৎস বেদনাদায়ক) সংবরণ হইয়া যায় ও শুদ্ধ-চিত্ত পুরুষ অতি সৌম্য স্বয়ং জ্যোতিঃ আত্মালোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি লাভ করিতে থাকেন ও অন্তে মোক্ষলাভে কৃতকৃত্য হন। সুতরাং মুক্তিকে—মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, কিছুই লাভ হইবে না। মোক্ষলাভের জন্যই ত ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়, আর ঐ শরণাপত্তির নামই ভক্তি। অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাই ভক্তি। পরন্তু জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞানের নাশ কিরূপে হইবে? এইজন্য আপ্তকাম (আত্মারাম) ঋষিগণ ঈশ্বরে ভক্তি পথে পরিচয় নিয়া তাঁহার সেবা করিতে বলিয়াছেন। সেবার দ্বারা হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ হইবে আর হৃদয় স্বচ্ছ হইলে পর সেই আরাধ্য বস্তুস্বরূপের জ্ঞান লাভ হইবে ও পরে মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলে কিছুই লাভ হইবে না। শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন—নির্গুণ উপাসক আপন আপন সমর্থ শ্রীগুরুকৃপাসামর্থ্যেই আমাকে লাভ করেন, কারণ তিনি নিজেকে (পরিপক্ক) পরমাত্মারূপই জানেন—"তে প্রাপ্নুবন্তিমামেব।" পরন্তু শ্রীগুরুকৃপা অবস্থায় প্রাপ্ত সগুণ-উপাসককে (বিশ্বরূপের উপাসককে) আমি স্বয়ং সংসার-সাগর-পারে লইয়া যাই, আমি সে ভব-পারের কাণ্ডারী, আমি কর্ণধার—"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।" এখন প্রশ্ন হইতে পারে—তাঁহার পার করিবার রীতিটি কেমন? উত্তরে বলিতে হয় "তত্ত্বজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ হৃদয়ে জ্বালাইয়া" মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। গীঃ ১০।৯-১০।১১ বিষ্ণুভিধেয়াগঃ। [আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিষ্ণুগতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি"—শ্রীধরস্বামী]। সুতরাং জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হইতে দূরে পলায়ন করিলে ভক্তের কল্যাণ কিরূপে হইবে?

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না। ইহাই সর্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলেন—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তাঁহাকে অভেদাত্মরূপে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা, তদ্ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রমের বা মুক্তির অন্য পথ নাই। ভগবান্ শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন—

"সংসারোত্তরণে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেব হি।
তপো দানং তথা তীর্থমুপায়াঃ প্রকীর্তিতাঃ।
যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।

—যোঃ উপঃ, ৭০।৩৭।

অর্থাৎ "একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার উত্তীর্ণ হইবার উপায়। তপস্যা, দান বা তীর্থ ইহারা উপায় নহে। যে পর্য্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ শ্লোকসমূহে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল সাধনের মধ্যে "অব্যভিচারিণী ভক্তিকে" (গীঃ ১৩।১০) জ্ঞানের অন্যতম সাধন বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভক্তিবাদী মুখ্যতঃ টীকাকার ভক্তপ্রবর শ্রীধরস্বামী

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার সূচনাতে বলিয়াছেন—"ভক্ত-সকলকে আমি মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি, ইহা ভগবানের (১২।৭ শ্লোকে) পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা, কিন্তু মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে উদ্ধার আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই, এইজন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় (১৩শ অঃ) আরম্ভ করা হইয়াছে।" "হৃতসংহিতা"তে উক্ত হইয়াছে—'জ্ঞানমেব হি মহাবিদ্যো মোক্ষসাধনমুচ্যতে।" (জ্ঞান যোগখণ্ড, ৭:১৬)। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ সত্ত্বেও যদি কোন ভক্ত জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার সংসার মুক্তি কিরূপে হইবে?

নিষ্কামকর্ম্মরূপ ভগবৎসেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমোভাব এবং কামলোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয় এবং চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—ইহাই মুক্তি। এইরূপ আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়। ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি ইহাই ক্রম। বিনা ভক্তিতে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, আবার বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। (ক্রমশঃ)

"ভক্তমাল"-এর ভক্তচরিত কথা

শ্রীশ্যামন্তক গুপ্ত এম. এ

শ্রীগুরুর প্রণাম মন্ত্রে শ্রীগুরুচরণাশ্রিত জনেরা উচ্চারণ করেন 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ'। কিন্তু শ্রীগুরুই যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুরূপ অবলম্বনেই নিজেকে প্রকাশ করেন, সেটি অনুভবগম্য না হলে, এই প্রণাম মন্ত্রটি অর্থহীন হয়ে যায়। গুরুই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই গুরু—এই তত্ত্বটী যাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছে, তিনি যে কত ভাগ্যবান্ সেটিই বলা হয়েছে 'ভক্তমাল'-এর চরিতগাথায় শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজার কাহিনীতে।

অতীতে পৃথ্বীনাথ নামে গুরুগত প্রাণ এক অতি ভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুকে দান করে অতি প্রসন্ন মনেই দিনাতিপাত করছিলেন। শ্রীগুরু অবশ্য তাঁর সেই দান তাঁকেই প্রত্যর্পণ করেন, ঠিক যেমনটি করেছিলেন গুরু শ্রীশ্রীরামদাস তাঁর শিষ্য প্রবলপ্রতাপান্বিত ছত্রপতি রাজা শিবাজীকে। পৃথ্বীনাথও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তাঁর গুরুর প্রতিনিধি মাত্র, নিজে রাজা ন'ন, এই বোধ নিয়ে।

একবার তাঁর শ্রীগুরু যখন দ্বারকানাথজীর দর্শনমানসে শ্রীধাম দ্বারকার দিকে যাত্রা করেন, রাজা পৃথ্বীনাথও তাঁর সাথে গমন করেন, যাতে তাঁর শ্রীগুরুর সেবায় কোনও ত্রুটি না হয়। তাঁর এই গুরুভক্তি দেখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং স্বপ্নযোগে আদেশ দেন তাঁকে ঘরে ফিরে গিয়ে ভগবন্নাম নিতে। 'পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরে যাও, ঘরেতে বসিয়া গিয়া মোর নাম লহ। প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর, গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার'। কিন্তু এই আজ্ঞা রাজার প্রাণে কোনও সাড়া জাগালো না। তিনি ভাবলেন যে শ্রীগুরু ও সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই; তাই, তিনি যদি গুরু সেবার জন্য স্বপ্নে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তাতে কোনও দোষ হবে না। কিন্তু ভগবান্ পুনরায় স্বপ্নযোগে একই আজ্ঞা দিলেন—'তুমি ফিরে যাও ঘরে, সেখানে আমার নাম কর।' নিরুপায়ে পৃথ্বীনাথ তখন শ্রীগুরুর কাছে গিয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত ও স্বপ্নাদেশ সবই তাঁকে জানালেন।

শিষ্যের কথা শুনে শ্রীগুরু চমৎকৃত হয়ে বললেন 'আহা!

যদি বাপু তব বলিহারি যাই, তুমি ধন্য তোমার জগত সেব নাই।' তিনি অবশ্য শ্রীভগবৎ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে ঘরে ফিরে যেতেই রাজাকে আদেশ করলেন। রাজা বিষণ্ণ অন্তরে এবার গৃহে ফিরে গেলেন। তিনি যে শ্রীগুরুসেবা থেকে বঞ্চিত হলেন এই দুঃখ শুধু নয়, তাঁর বিষণ্ণতার এও কারণ ছিল যে, না তাঁর দ্বারকাধীশের দর্শন হল, না হল তাঁর গোমতী স্নান, না হল রীতি অনুযায়ী তপ্তমুদ্রা ধারণ। তবুও ফিরলেন তিনি, কারণ ইতি পূর্ব্বে শ্রীভগবানের আজ্ঞা তিনি বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘন করলেও গুরুর আজ্ঞা তাঁর কাছে অলঙ্ঘনীয়ই ছিল।

ঘরে ফিরবার কয়েকদিন পর রাজা রাত্রে হঠাৎ দেখলেন তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়েই গোমতীর জলধারা বয়ে চলেছে সানন্দে। বিমূঢ় বিস্মিত রাজা আরও দেখলেন যে স্বয়ং দ্বারকাধীশ ও ত্রিবিক্রমরায়জীর শ্রীবিগ্রহদ্বয় তাঁর প্রাসাদের মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং দ্বারকার ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা এসে তাঁর বাহুমূলে তপ্তমুদ্রার ছাপও দিয়ে দিলেন। প্রভাতে রাজা সকলকে ডেকে যখন এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণন করলেন ও অদ্ভুতপূর্ব্ব বিষয় তাঁদের দেখালেন, তখন রাজার জয় গানে দশদিক মুখরিত করে সকলে সানন্দে গোমতীজলে স্নান ও শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের পূজা করলেন।

গুরু ভক্তির এই মাহাত্ম্য বর্ণন করে চরিতকার আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করে পৃথ্বীচরিতকথায় যতি টেনেছেন। তিনি বলেছেন বৈদ্যনাথধামে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য বহু জপ তপ ও ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। কিছুকাল পর স্বপ্নযোগে স্বয়ং মহাদেব তাঁকে আদেশ দেন—'তুমি যদি একবার রাজা পৃথ্বীনাথের কাছে তাঁর ব্যবহৃত গামছা দিয়ে তোমার চোখ মুছতে পার, তবে তুমি আবার তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।' সেই ব্রাহ্মণ তখন বহু কষ্টে রাজার কাছে উপনীত হয়ে তাঁর ব্যবহার করা গামছা চেয়ে নিলেন। তিনি যেমনই তাই দিয়ে তাঁর চোখ মার্জনা করলেন, অমনি ভগবৎ কৃপায় তাঁর দীর্ঘকালের অন্ধত্ব তিরোহিত হল এবং তিনি আবার পূর্ণ দৃষ্টি শক্তির অধিকারী হলেন।

গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার অপার্থিব শক্তি সম্বন্ধে চরিতকার যে চরিতকথার উল্লেখ করেছেন, তার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই অতি সংক্ষেপে মূল সূত্রটি জানিয়েছেন যা শুধু তাঁর নয়, সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত সবার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য :—

'গুরুভক্তি বিনে কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে'

মহাপুরুষপ্রসঙ্গ

(ইষ্ট এবং তাঁর আত্মনিবেদিত ভক্তের ভিতর দেওয়া-নেওয়া)

শ্রীরাধাবল্লভ দে

রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী শ্যামা মা। এক রাত্রের প্রবল ঝড়ে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙিয়া পড়ে। রামপ্রসাদ নিজেই বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী খুঁটি ফিরাইয়া দিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। খেয়াল খুশি মত চঞ্চলা বালিকা চলিয়া গিয়াছে। হাতের কাজ ও মাতৃ-সঙ্গীতে সাধক তন্ময়। ইত্যবসরে ধ্যানের ঠাকুরাণী ভক্তের টানে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের কাজ শেষ করিয়া আবার অন্তর্ধান হইলেন। এখানে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ভক্তের ঐকান্তিক ভক্তির আকর্ষণে ব্রহ্মময়ীকে সাকাররূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ভক্ত সাধক গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনীতে দেখি তাঁহার রচিত অপূর্ব গ্রন্থ রামচরিতমানসের পাণ্ডুলিপি

চুরি করিতে কাশীর দুটি কুখ্যাত চোর তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন এক দিব্যভাবি শ্যামল কিশোর ধনুর্বাণ হাতে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতেছেন। চোর দুটি পরদিন এ কাহিনী ভক্তবীরকে বিদিত করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়াছিলেন, ঐ তেজপুঞ্জ কলেবর পাহারাধারীটি তাঁহারই প্রভু রঘুনাথ।

বহুবিশ্রুত ওজস্বিত্ব মহাপুরুষ রামক্ষেপার জীবনীতে দেখি তাঁর ইষ্টদেবী তারাপীঠে তারা মা নাটোরের রাণীকে স্বপ্নযোগে জানান মন্দিরের পুরোহিত এবং দারোয়ান নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে তাঁর প্রিয়তম ভক্তকে। এ আঘাত পড়েছে তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঙ্গে। তাঁর আদেশেই সে নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেছিল, যার জন্য চারদিন তাকে প্রসাদ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তিনিও উপবাসী। আর একবারের ঘটনা—একদিন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ক্ষেপাবাবা বিগ্রহের গায়ে মূত্রত্যাগ করেন। এবারেও আসে মায়ের প্রত্যাদেশ। তারাপীঠে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠান, মায়ের পূজা পূর্ববৎ চলিবে, দেবীবিগ্রহ অপবিত্র করার প্রশ্ন উঠে না। মায়ে পোয়ের ব্যাপারে অপরের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

শুদ্ধসত্ত্ব অপাপবিদ্ধ সাধক রামকৃষ্ণের জীবনীতে দেখি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ইষ্টদেবী ভবতারিণীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বৈধীভক্তির বাঁধন, পূজা ভোগরাগের নিয়ম-কানুন শিথিল হইয়া পড়িল। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ গেল। রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুর বাবু উপলব্ধি করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত প্রেমভক্তি এবং ভাবতন্ময়তায় বিভোর। ইষ্টদেবী নানাভাবে তাঁহাকে দর্শন দিতেছেন এবং প্রেরণা নির্দেশও দিতেছেন। আদেশ প্রচারিত হইল, তাঁর কাজে কেহ বাধা না দেন। এই সময়ে ভবতারিণী কৃপাতেই শরণাগত ভক্ত তন্ত্রসাধনের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের শুরু বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হন।

সাধক কমলাকান্ত তন্ত্রসাধকের ইষ্টদেবী বিশালাক্ষী। শক্তিধর তন্ত্রসাধক রাতদিন দেবীর মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনায় মগ্ন, খাওয়া দাওয়ার ভাবনায় পত্নী চিন্তান্বিতা। এই সংকট সময়ে দুইটি পরিচারক, সঙ্গে এক শ্যামবর্ণা লাবণ্যময়ী কিশোরী বহু খাদ্য পূর্ণ দুইটি চাঙারি দিয়া গেলেন। এই ঘটনাটি তার ইষ্টদেবীর কিশোরীর ছদ্মবেশে এক স্নেহলীলা। আর একদিনের কথা। দেবীর সেবায় প্রাচীন প্রথানুযায়ী রাত্রিতে মৎস্য রন্ধন করিয়া ভোগ দিতে হয়। একদিন গভীর নিশীথে ধ্যান টুটিয়া মৎস্যের অভাব-জনিত বিঘ্ন তার কাণে বাজিয়াছে। হঠাৎ জগজ্জননী রাণী নারীর ছদ্মবেশেএকজোড়া মাগুর মাছ দিয়া গেলেন। আরও একদিন জগজ্জননী গোয়ালিনী বেশে আসিয়া কমলাকান্তের আবেগভরা গান শুনিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ভক্ত সাধকের জগন্মাতার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া এক অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়িয়া উঠে। ইষ্টের সঙ্গে হয় একাত্মবোধ। বাহিরের বিগ্রহ তখন চিন্ময় মূর্তিরূপে আত্মনিবেদিত সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই আবার দুলদেহ পরিগ্রহ করিয়া সাধককে দর্শন দেন। পরমহংসদেব এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেছেন সমুদ্রের জল অসীম অনন্ত কিন্তু হিমে কোথাও কোথাও বরফরূপে সাকার হয়, সেই রকম ভক্তের প্রেম ভক্তির পরা-কাষ্ঠার টানে ভগবান সাকার রূপে ভক্তকে দর্শন দেন। সেই অন্তর্যামীই আবার সূক্ষ্মরূপে অন্তরে প্রেরণা নির্দেশও দেন। ইষ্ট এবং তাঁর আত্মনিবেদিত ভক্তের ভিতর দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলিতে থাকে এক দুর্জ্ঞেয় চিরন্তন ঐশী নিয়মে।

"মিষ্টিমুখে আদরের সহিত কথা কহিতে যে পারে, তাহার কাছে সকলেই বশীভূত হয়, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।"—শ্রীসত্যদাস

বিষ্বার্কসহস্রনাম

ব্যাখ্যাতা—অধ্যক্ষ শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়, ন্যায়তর্কতীর্থ

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৮৮) প্রেমমূর্তিঃ—তিনি প্রেমের বিগ্রহ। জীবকুল যখন ব্যাকুল-আর্ত-ঘাতনায় নিপীড়িত তখন তিনি ভালবাসা দ্বারা জীবকুলের সমক্ষে প্রেমাবতাররূপে অবতীর্ণ হন—প্রেম যেন দেহ ধারণ করিয়া দেহী জীবের সমক্ষে উপনীত। সে ভগবৎপ্রেমের তুলনা নাই। যাহা গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়—("প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে") কেবল তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর (মন্মনা ভব), আমাকেই ভক্তি কর, ভক্তিই ও প্রেমের চরম পরিণতি; (মদ্ভক্ত)—(মদ্যাজী) যাগ-যজ্ঞ যাহাই কর না কেন, তাহা আমার উদ্দেশ্যেই কর—(মাং নমস্কুরু) কিছু না পার ও আমাকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম কর। আহা—কি করুণা, তাই মহাভারতে বলিলেন—একস্য কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামঃ শতাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।

শতাশ্বমেধী পুনরেতি মর্ত্যং কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়। একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন—তাহা শত শত অশ্বমেধযাগের অন্তে পবিত্র স্নানের তুল্য কিন্তু শত শত অশ্বমেধযাগকারীও "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর আর পুনর্জন্ম হয় না। "তত্রৈব সমবলীয়ন্তে ন পুনরাবর্ত্তন্তে।" অতএব সেই প্রেমঘনবিগ্রহ বাসুদেবই নিষ্কারণদেহে আচার্যরূপে দীপ্তশিরাঃ ব্যাকুল জীবকুলের উদ্ধারের জন্য উপনীত। তাই তিনি প্রেমমূর্তী।

৮৯ কৃপানিধিঃ—করুণা করুণা কৃপা দয়া অনুকম্পা প্রভৃতি শব্দদ্বারা যাহা প্রকাশিত তাহাই কৃপা। তাহার নিধি আছে বা শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি যে কৃপানিধি তাহা তাঁহার প্রেমমূর্তীতেই প্রকাশিত। তাঁহার ও কেহ মিত্র বা শত্রু নাই (যেমন ভগবান্ বলিলেন "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ কামবর্ষী পর্জন্য যেরূপ সর্বত্র সমভাবে অমৃতধারাবর্ষণ করেন সেইরূপ ভগবান্ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। তাই তিনি কৃপানিধি।

সর্বাশ্রমাঙ্গসংমিশ্রো (৯০) ভিক্ষু (৯১)

ভিক্ষাশনো (৯২) যতিঃ (৯৩)।

যোগী (৯৪) যোগেশ্বরো (৯৫) যোগ্যো (৯৬)

ভক্তিযোগপ্রবর্তকঃ (৯৭)। ৪৫।

(৯০) সর্বাশ্রমাঙ্গসংমিশ্রঃ— ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু (সন্ন্যাস) এই চারিটি আশ্রম—সেই আশ্রমধর্ম পালন করেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ। এই বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিতে গেলে যে যে কার্য করে ষড়ঙ্গের সহিত বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন। যাহার স্বরূপ সৎ-চিৎ ও আনন্দরূপে প্রকাশিত—যাহাকে বুঝাইতে হইলে নাম ও রূপের মাধ্যমে বুঝাইতে হয় বিশেষ যাহা কিছু জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সবই তিনি, তাই সর্ব আশ্রম ও অঙ্গপদ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। তিনি সর্বসাধনাসিদ্ধ জগতের যে সব বাঞ্ছিত তাহার সমষ্টি তিনি। যত ভেদজ্ঞান তাহার অভিন্নাশ্রয় তিনি। যেন অঙ্গ উপাঙ্গ প্রভৃতির সমষ্টি জীব। যেমন অঙ্গ-কর্ম দ্বারা অঙ্গীপ্রধান যাগের নিষ্পত্তি। তাহা সর্বত্র সর্বাশ্রয় শব্দ দ্বারা বলা সম্ভব হইলেও বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ যে আশ্রম ও অঙ্গ তাহাও যে তিনি অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর যে কিছুই নাই—তাহারই পূর্ণতায় অপূর্ণজীব সর্বদা মিলনে সমুৎসুক, তাহাই এই নামে সূচিত হইয়াছে। সংমিশ্র পদটি আরও মনোহর—তুমি যত ভেদবুদ্ধিরই সৃষ্টি কর না কেন, তাহার সমষ্টি কিন্তু তিনি—তাহার মিলনক্ষেত্র

তিনি, তাঁহাতেই সমস্ত তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত। এমন প্রেমঘন মূর্ত্তি কল্পনাতীত—আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-বাসনার সমষ্টি-মহান্ কাম্যবস্তু তিনি ব্যতীত কে হইবেন? তাই এই স্থলে এই পদগুলির তাৎপর্য্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একমাত্র তিনিই আছেন—তাঁহার সত্তাই সত্তা—সেই পূর্ণ-সত্তার আনন্দঘন মূর্ত্তিতে আমরা সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হই—কৃতার্থ হই।

(ক্রমশঃ)

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্"

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।

গীতা ১৫।১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে। ১৫।২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ১৫।৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
১৫।৪

জ্ঞান ষটকের পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে, পুরুষ ও প্রকৃতির কথা, বিশেষ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রকৃতির কথা, বলিবার পর, এই কথাই আসে যে পুরুষের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে যে, তাহার কর্ম্মফলের (যাহা তাহার প্রারব্ধের স্রষ্টা), মূল অর্থাৎ প্রকৃতিতে তাহার যে তদাত্মকত্ব (গীতা ১৩।২১) তাহাকে অতদাত্মকত্ব অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া পরমপুরুষের শরণাগত হওয়া।

এই কথাই উল্লিখিত গীতার শ্লোকদ্বয়ে উপদেশ করা হইয়াছে। শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এখানে আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন ঊর্দ্ধে যাহার মূল এবং নিম্নদিকে যাহার শাখা জ্ঞানীরা তাহাকে অশ্বত্থ এবং অব্যয় বলিয়াছেন। ছন্দ এই বৃক্ষের পত্রসমূহ। যিনি এই বৃক্ষকে চিনিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে তিনিই জ্ঞানী। অতি সুদূর অতীতে সৃষ্ট হইয়াছে মানুষের কর্ম্মফল, মানুষের সৃষ্টির সহিত। এই কর্ম্মফলকে, বৃক্ষের সমান কল্পিত করিয়া। প্রকৃতিতে পুরুষের তদাত্মকত্ব, এই বৃক্ষের মূল, যাহার গোড়াপত্তন হইয়াছে সেই ঊর্দ্ধে, অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতে, সৃষ্টির সময়ে এবং এই বৃক্ষের নীচের দিকে, অর্থাৎ বর্ত্তমানের দিকে আসিবার সহিত, তাহার পরলোকগতী শাখাগুলি জন্মিয়া চলিয়াছে। অশ্বত্থ, অর্থাৎ যাহা কালপর্য্যন্ত থাকিবে এমন নহে এবং অব্যয়, অর্থাৎ যাহা আকারে ছোট হইয়া যায় না, অর্থাৎ ভোগে কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকিলেও, জীবের প্রতি মনুষ্যজন্মে এত সৃষ্ট হইতে থাকে যে এই কর্ম্মফলের মোট সংকলের কোনও ন্যূনতা আসে না। ছন্দ, অর্থাৎ সূক্ষ্মধর্ম্মী সঙ্কল্প-বিকল্পসমূহ যাহা এই বৃক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে ও ইহাকে ভারী করিয়া রাখে। ঐশ্বর্য্য ও আনন্দময়, ইহারাও ছন্দের অর্থ এবং ইহারাও এখানে খাটে। সঙ্কল্প ও বিকল্পকে আমরা বর্ণোজ্জ্বল ও আনন্দময় দেখি বলিয়াই আমরা তাহাতে মজিয়া থাকি। বেদের বিনিনিষেধ, এ অর্থ খাটাইতে, অনেক টানাটুনা করিতে হয়। বেদ শব্দ আনা হইয়াছে বলিয়া, ছন্দ শব্দ আনা হইয়াছে, পারিভাষিক-ভাবে বেদের ছন্দ ভাবে নহে। বেদবিৎ=প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাতা।

ইহার শাখাগুলি, ঊর্দ্ধদিকে এবং অধোদিকে বিস্তৃত এবং সত্ত্বাদি গুণপুষ্ট (১৪।৫-৮ ইত্যাদি)। ইহার পল্লবগুলি রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ এবং নিম্নে, মনুষ্যলোকে, ইহার অনুগত

যে মূলগুলি কর্মজড়িত, তাহা বিস্তৃত হইতেছে। কর্মফল মানুষকে (অর্থাৎ তাহার সত্ত্ব দেহকে) উর্ধ্বে দেবলোকে ও নিম্নে নরকে প্রেতলোকে ও নীচ যোনিতে লইয়া যায়। (অশ্বিষ্ঠ-মিষ্টং মিশ্রক ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ১৮।১২)। কারণাদি সমূহ পল্লবগুলির সহিত সংযুক্ত থাকে। ঐ যে নূতনভাবে পাতা-গুলি, অর্থাৎ মনের সঙ্কল্পবিকল্পগুলি যে কর্মফল জীবা-ত্মাকে নরলোকে, কর্মভূমিতে আনিয়া কর্ম করায়, তাহার কাজ অবান্তর মূলের মত অর্থাৎ নূতনভাবে শিকড় গাড়ার মত হয়। এই বৃক্ষের কল উপলব্ধি করা যায় না। ইহার আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ প্রধান অংশ, যাহাকে লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা), এসব নির্ণয় করা যায় না। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের সেই অতি দৃঢ় মূল (প্রকৃতির সহিত পুরুষের তাদাত্ম্যরূপ) তাহাকে দৃঢ় অসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা (অ-তাদাত্ম্যরূপী জ্ঞানের দ্বারা) ছেদন করিয়া, (এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া:) সেই আদি পরম পুরুষের, পুরুষোত্তমের শরণাগত হইলাম, যাঁহা হইতে আমাদের আদি প্রবৃত্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা সকল (১৮।৪৬) উৎসারিত হইয়াছে। সেই পরমপদ, আমাদের প্রকৃষ্টরূপে সন্ধান করিতে হইবে, যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

এই শ্লোকগুলি ভাবে ও কবিতা হিসাবে অতি চমৎকার। আত্মানাত্মবিবেকের সহিত, পুরুষকার ও শরণাগতির অতি সুন্দর সম্মিলন। ভক্তের জন্য উপায় তো রহিয়াছে; তাহা শরণাগতি, তাহা কাতর প্রাণে ডাকা;—"কামনার মোহপাশ ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস", "কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্" কিন্তু পুরুষকারও চাই। দৃঢ় পুরুষকারের সাহায্যে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া পরমপুরুষের শরণাগতি পাইতে চেষ্টিত হইলে, তবেই তাহা পাওয়া যাইবে।

এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রতি জনেই নিজনিজভাবে করিয়াছেন। হয়তো সত্যই আমরা দৃষ্টিহীন; কারণ, ঐ ব্যাখ্যার অনেক স্থান, আমাদের নিকট কেমন কেমন ঠেকিতেছে। ব্যাখ্যাকারেরা এই মূর্খের অপরাধ লইবেন না। এই বৃক্ষকে কেহ ব্রহ্ম-বৃক্ষ, কেহ মায়া-বৃক্ষ, কেহ জগৎবৃক্ষ, কেহ সংসারবৃক্ষ, কেহ কর্মবৃক্ষ বলিয়াছেন। বলুন, কিন্তু তাঁহাদের সেই ব্যাখ্যাগুলিতে, মূর্খ আমরা সঙ্গতি পাই নাই। যথা—ব্রহ্মবৃক্ষের অর্থ কি? ব্রহ্মবৃক্ষ পরদিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে না, ইহাই বা কিরকমের হয়? ব্রহ্ম-বৃক্ষ আবার পৃথিবীতে শিকড় ফেলিতেছে তাহারই বা কি অর্থ! ব্রহ্ম বৃক্ষের পত্র বেদ, ইহা না হয় বোঝা গেল, কারণ বেদসকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; কিন্তু ব্রহ্মবৃক্ষের শাখা নরকাদিতে যায়, ইহাই বা কি রকম? ব্রহ্মবৃক্ষকে কাটিবার অর্থ কি? ব্রহ্মকে অস্বীকার করা? কেহ এই বৃক্ষকে সংসারবৃক্ষ বলিয়াছেন। সংসারের প্রতি আসক্তি ধ্বংস করা, এ বোঝা যায়। কিন্তু সংসারকে ধ্বংস কর, এ কিরূপ বৈরাগ্য! অনেক ব্যাখ্যায় এইরূপ নানা প্রশ্ন উঠে; মূর্খ আমরা গোলমালে পড়িয়া যাই। ঊর্ধ্বমূলং-কেহ এই মূলকে ক্ষর ও অক্ষর অতীত পুরুষোত্তম, কেহ চতুর্মুখ, কেহ মহৎতত্ত্বাত্মক চতুর্মুখ, কেহ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, মায়াযোগযুক্ত হইয়া ইহার মূল হইয়াছেন, বলিয়াছেন। যাঁহারা মূলকে চতুর্মুখ ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা হইতে ইহাই বাহির হয় না কি যে চতুর্মুখকে কাটিয়া ফেলা কর্তব্য। কঠো উপনিষদে আছে: ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। (কঠ ৬।১)। কিন্তু উপনিষদের শ্লোকে যাহা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ, গীতায় তাহা খাটাইতে গিয়া টীকাকারেরা, আমাদের মনে হয়, গোলমাল করিয়াছেন। তুলিলে চলিবে না যে, গীতায় আছে: "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" (৫।১) "কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে" (৫।২) "দৃঢ়েন ছিত্ত্বা" (৫।৩) (কাটিয়া ফেলা উপনিষদে নাই)। "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী (৫।৪)—ইহাও নাই। "ঊর্ধ্বমূলম্" "অবাক্‌শাখম্" এই কথা কয়েকটি উপনিষদে ও গীতায় থাকিলেও উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে এবং গীতায় এই শ্লোকগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে, আমাদের সুস্থবুদ্ধিতে মনে হয় তাহা এক নহে। (কঠ ৬।১; মৈত্রেয়ী ৬।৪, ৬।১৫, শ্বেতাঃ ৩।৯, ৩।৬ দ্রষ্টব্য)।

আচার্য শঙ্করও সংসারবৃক্ষ বলিয়াছেন। কাল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সকলকার কারণ, নিত্য ও মহান্ হওয়ায়

জন্য, অব্যক্ত মায়োপাধিযুক্ত বস্তু, সকল অপেক্ষাও উচ্চ বলা হয়। সেইই ইহার মূল; সেইজন্য সংসারবৃক্ষের উপরদিকে মূল; শ্রুতি দ্বারাও তাহা প্রমাণিত। আচার্য্য রামানুজ এই বৃক্ষকে সংসারূপ বৃক্ষ বলিয়াছেন, চতুর্মুখ ইহার আদি ইত্যাদি। মধুসূদনও বলিয়াছেন, বিশ্বাসের অযোগ্য মায়াময় সংসারবৃক্ষ।

আরও দুই এক কথা এ বিষয়ে নিবেদন করিতে চাহি। অশ্বত্থ, ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা হয়, অ—শ্ব—ত্থ, অর্থাৎ নাহি-কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এব্যাখ্যা তৎপরতার সহিত টীকাকারেরা তো গ্রহণ করিবেনই, কারণ তাঁহাদের "অস্থায়ী সংসার" ইত্যাদি কথাগুলির সহিত খাপ খায়। কিন্তু, শ্লোকে "অব্যয়" বৃক্ষের, এই বিশেষণের প্রতি তাঁহাদের কেন দৃষ্টি পড়ে নাই? সংসার ক্ষণস্থায়ী, আবার ব্যয়ও হইয়া যায় না, এই দুই কথার কি সমন্বয় হয়? আমাদের পরিচিত অশ্বত্থবৃক্ষ, একেবারেই অস্থায়ী বৃক্ষ নহে; ইহা দৃঢ়মূল, অব্যয় ও সদাই বিবর্দ্ধমান—সেইজন্য ব্যুৎপত্তি লইয়াই আমরা ব্যাখ্যা করিলাম, নাহি-মাত্র কালপর্য্যন্ত-স্থায়ী, অর্থাৎ ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী। ঊর্দ্ধমূল, অর্থাৎ ইহা প্রাচীন অবিদ্যা [অর্থাৎ আত্মার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির সহিত তাদাত্ম্যবস্তু] যাহা জীব, স্রষ্টার সহিত অস্তিত্ব পাইয়াছে ও যাহা রূপকের ভাষায়, বৃক্ষরূপী, বিবর্দ্ধমান কর্ম্মফলকে জীবের সঙ্গী করিয়া দিয়াছে। কবে হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহা জানা যাইতে পারা যায় না। তবে কল্পনা করা যাইতে পারে যে, অতি দূর অতীতকে যদি ঊর্দ্ধ বলা হয়, আর বর্দ্ধমান কর্ম্মফলকে, কর্ম্মফলরূপ বৃক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে তাহার মূল সেই ঊর্দ্ধে রহিয়াছে, এবং উহা নীচের দিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইতে ছড়াইতে বর্ত্তমানে আসিয়াছে। বিবর্দ্ধমান এই বৃক্ষের মাথাটা এখন বর্তমানে, ইহা উল্টা বৃক্ষের মত। সেইজন্য এই কর্ম্মফলবৃক্ষকে ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ বলা হইয়াছে। বর্ণনাকে রূপকভাবে লইতে হইবে, কারণ এরূপ কোনও উল্টা বৃক্ষ হয় না। কর্ম্মফলবৃক্ষের 'অব্যয়' এই বিশেষণই প্রকটিত করিতেছে যে এই বৃক্ষ বরাবর থাকে, ইহাতে ন্যূনতা থাকে না। কর্ম্ম বিনা মানুষ থাকিতে পারে না। তাই ভোগে কর্ম্মফল যেমন যেমন খরচ হইতে থাকে, নূতন নূতন কর্ম্মফল আসিয়া তাহাকে বাড়াইতেই থাকে। প্রলয়ে কর্ম্মফল ধ্বংস হইয়া যায় না, জীবের সহিত প্রকৃতিতে সূক্ষ্মভাবে থাকে; ও প্রলয়ান্তে, সৃষ্টি প্রকটিত হইবার উপযুক্ত সময়ে, কর্ম্মফলই জীবকে প্রকৃতির ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে ও চালাইয়া লইয়া চলে। কর্ম্মফলই জীবকে যোনি হইতে যোনিতে চালিত করে। টীকাকারেরা বৃক্ষের অর্থ, বেদের ব্যবস্থা সমূহ লইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহাতে অনেক টানাটানি করিতে হয়। গীতাকার পত্রসমূহকে রূপরসাদি সম্বন্ধ বলিয়াছেন, পত্রের উদ্ভূত পত্রসমূহ রূপ-রসাদি পুষ্পাদিযুক্ত নিশ্চয়ই, তাহারা বেদের ব্যবস্থাদি বলিলে সঙ্গতি কি ঠিক হয়? কর্ম্মফলবৃক্ষের শাখাগুলি কোনটা ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে। এখানে, ঊর্দ্ধ অর্থে অতীত নহে, ঊর্দ্ধলোকে। কর্ম্মফলই এই বৃক্ষের কোন শাখাকে কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে আনিয়া যেন নূতন এক শিকড় ফেলে (বটগাছ যেমন ঝুরি নামায়) যে শিকড় নূতন কর্ম্মের জন্ম দেয়। মনে রাখা দরকার মূল হইতে না কাটিলে অশ্বত্থ বৃক্ষ ধ্বংস হয় না। "পুরাণী প্রবৃত্তি"—আদিম প্রবৃত্তিসকল বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই। প্রবৃত্তির এক অর্থ কর্ম্মপ্রচেষ্টাসকল, যাহা জীবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে আসিয়াছে; (সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা, (৩.১০); যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ (১৮.৪৬) প্রবৃত্তি মার্গ [নিবৃত্তিমার্গ (সান্ত্বিকী শ্রদ্ধা)র বিপরীত] ভগবদুপদিষ্টই। এই প্রবৃত্তিমার্গেরও উপদেষ্টা সেই নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষিদ্বয়। তাঁহাদেরই বাণী কর্ম্ম ও জ্ঞান একসঙ্গে থাকিতে পারে ও থাকা দরকার। মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, জগৎ রক্ষার্থে, 'প্রবৃত্তি ধর্ম্ম' পালনের দ্বারা। 'প্রবৃত্তি' পারিভাষিক কথা, সাধারণ অর্থ ইহাতে যেন না লাগান হয়।

টীকাকারদের ব্যাখ্যাসমূহ এ মুখেই যাবা গৃহীত হয় নাই, সুধীজনেরা যেন এ মুর্খকে ক্ষমা করেন। *

* প্রবন্ধোক্ত গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যাগুলি প্রবন্ধকারের নিজস্ব ব্যাখ্যা। ইহা অভিনব ব্যাখ্যা হইলেও সুধীজনের বিবেচ্য।—'সম্পাদক'

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কি জন্মগত অথবা গুণকর্ম্মগত ?

(কোন্‌টি শাস্ত্রসম্মত ?)

ভক্টর অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম. এ, পি এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত-বেদান্ততীর্থ।

৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও—" তস্মান্না ব্রাহ্মণঃ শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ। তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু সংকলয়া বৃতঃ ॥ —ভাগবত ১০।৮৬।৫৩

— [শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে (৫৯ নং পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত হইয়াছে] —এই উক্তিতে প্রথমে জন্মগত ব্রাহ্মণের সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরে তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রসন্নতা ও ভক্তি-যুক্ত ব্রাহ্মণের অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন

৬) ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুপ্রবাহণসংবাদে— "পঞ্চমা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ (ছান্দোগ্য উপঃ ৫।৩,৫) এই বাক্যে এবং "সত্যকামো জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি" (ছান্দোগ্য—৪।৪।১)—এই প্রকার সত্যকামের জবালা মাতার প্রতি গোত্র জিজ্ঞাসা হইতে সত্যকাম যে ব্রাহ্মণজাতি তাহা অবগত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত বা জন্মগত না হইলে সত্যকামের গোত্রে জিজ্ঞাসা করা হইত না। কারণ 'গোত্র' জাতিগত বা জন্মগতই হইয়া থাকে।

আবার 'গোত্র' কেবল ব্রাহ্মণজাতিরই পৈতৃক সম্পদ, অন্য জাতির 'যাচিতমণ্ডনন্যায়ে' ব্রাহ্মণপুরোহিতগত সম্পদ—এইরূপই শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা— " যদ্যপি রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাব-স্তথাপি পুরোহিত গোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ। "যজ-মানস্যার্থেষান্ প্রত্নুনীত" ইত্যুক্ত্বা "পৌরহিত্যাদ্ রাজন্যবিশাং প্রত্নুনীতে" ইত্যাহাশ্বলায়নঃ"—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মিতাক্ষরা ২।৩২।

৭) গীতায় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩)—এই উক্তিতে 'সৃষ্টম্'—এই অতীতকালের প্রয়োগ হইতে ইহাই জানা যায় যে সৃষ্টি সময়ে ভগবান্ জীবের পূর্বজন্মার্জ্জিত গুণ ও কর্ম্মানুসারে 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভাষ্যাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন। মানবজাতির সৃষ্টির পরে গুণবিশেষ বা কর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিচারপূর্ব্বক চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ হইয়াছে এইরূপ অর্থ পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বে উল্লিখিত অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হয়। আর, যদি মানবের গুণ ও কর্ম পরিবর্ত্তন করিয়াই চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ করা হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া গর্ভাধান, পুং-সবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি যে সংস্কার সমূহ বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।১০-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) উহা একান্তই অসম্ভব হইত। কারণ ঐ সমস্ত সংস্কারগুলি একান্তভাবেই জন্মগত, গুণ ও কর্ম্মগত নহে।

৮) গীতার প্রথমাধ্যায়ে "উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ" ইত্যাদি অর্জ্জুনবাক্যে এবং "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্। (গীতা ৯।৩২)— —ইত্যাদি বাক্যে জাতিধর্ম্মাঃ, কুলধর্ম্মাঃ, পাপযোনয়ঃ প্রভৃতিপদের দ্বারা জাতি ও ধর্ম্মাদি যে জন্মগত তাহাই অবগত হওয়া যায়।

৯) যদি জন্মগত চাতুর্ব্বর্ণ্যও স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে "ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি। দেব-পূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্ ॥— শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণ-স্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্। গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ" ॥— (বিষ্ণুপুরাণ— ৩।১০।৮-৯); ' নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ। মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং

মুরস্য তু জুগুপ্সিতম্। শর্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষসংযুতম্ ।"—(মনুসংহিতা ২।৩০-৩২)— (অর্থাৎ পিতা বালকের জন্ম হইতে দশ দিনে বা দ্বাদশদিনে তাহার নামকরণ করিবে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক নাম হইবে, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দিত বা হীনতা প্রকাশক নাম হইবে। ব্রাহ্মণের নামের সহিত শর্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের সহিত বর্মা, বৈশ্যের নামের সহিত গুপ্ত, এবং শূদ্রের নামের সহিত দাস—এইরূপ ক্রমে নামকরণ করিতে হইবে। ইত্যাদি)— এইরূপ বালকের জন্মের দশম দিনে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদে শাস্ত্রোক্ত নামকরণবিধিরও আনর্থক্য হয়। কারণ জন্মের দশম বা দ্বাদশদিনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির স্বভাবোচিত গুণকর্মাদি বা স্বাভাববৈলক্ষণ্য বিকশিত হয় না, যাহা দেখিয়া তাহাদের নামকরণের পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। সুতরাং জন্মগত ব্রাহ্মণত্বাদি স্বীকার করিয়াই জন্মের দশমদিনে বা দ্বাদশদিনে নবজাতকের নামকরণ করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি, জাতিভেদানুসারে নামকরণের নিয়মেরও পার্থক্য করা হইয়াছে।

(১০) যদি মানবের গুণ ও কর্ম পরিবর্তন করিয়া চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ হইত তাহা হইলে পঞ্চমবর্ষে বা অষ্টমবর্ষে যে ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (যথা, "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" (শ্রুতিবাক্য)। "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্" (মনুসংহিতা ২।৩৬); ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে" [মনুসংহিতা-২।৩৭]; "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-১।১৪)—অর্থাৎ গর্ভ হইতে অষ্টমবর্ষ বয়সে, বা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অষ্টমবর্ষ বা পঞ্চমবর্ষ বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে) তাহা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ পঞ্চমবর্ষে বা অষ্টমবর্ষে মানবের গুণ ও কর্মানুরূপের স্বরূপসকল উদ্বুদ্ধ বা প্রকাশিত হয় না, যাহা দেখিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতির নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। [দ্রষ্টব্য :- ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নকাল যথাক্রমে গর্ভ হইতে একাদশ বৎসর ও দ্বাদশ বৎসর বিহিত হইয়াছে, যথা:—"গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ"—মনুসংহিতা ২।৩৬)

আর ঐরূপ অল্প বয়সে গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন দিলে ভবিষ্যতে তাহাদের গুণ ও কর্মের অন্যথাপরিণামদর্শনে তাহাদের উপনয়ন নিষেধ দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে শূদ্রাদিরূপে পরিণত করা অসম্ভব, এবং ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে একটা ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। অতএব ঐরূপ অল্পবয়সে মনুষ্যবালকের চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ তাহাদের প্রারব্ধ কর্মানুসারে শ্রীভগবদ্দত্ত জন্মের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব বর্ণবিভাগ জন্মগতই কেবল গুণকর্মানুগত নহে।

১১) অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম কখনই কেবল মাত্র গুণ ও কর্মগত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা কর্মানুসারে লব্ধ জন্ম বা জাতিগতই। কারণ প্রথমে জন্মের দ্বারা জাতি নির্ণয় করিয়া পরে সেই জাতির করণীয় কর্ম বা ধর্মের বিধান শাস্ত্রে করা হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কারণ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের তারতম্য বশতঃ একই মনুষ্যের মধ্যে কখনও সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও প্রাবল্যবশতঃ দয়া, ক্ষমা, তপস্যা, ত্যাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণের বিকাশ দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই রজঃ বা তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ ক্ষাত্রোচিত বা শূদ্রোচিত গুণের বিকাশ দেখা যায়। সুতরাং গুণও কর্ম দেখিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইলে একই মানুষকে কখনও ব্রাহ্মণ, আবার কখনও বা ক্ষত্রিয় বা শূদ্র বলিতে হয়, এবং তাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, ও বর্ণাশ্রমধর্মবিভাগেরও কোন স্থির নিয়ম থাকে না। সুতরাং শাস্ত্রের বর্ণাশ্রমধর্মবিভাগ জন্মগত বা জাতিগতই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

১২) যদি বলা যায় যে মোটামুটি প্রতিদিন যে সত্ত্বাদি গুণ যাহার মধ্যে প্রবলভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থান করিবে, তাহাকে তদনুসারে ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ বলিলেও সামাজিক বা গুণগত অব্যবস্থা দূর হইবে না। কারণ সমস্যা হইবে এই – প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কোন্ গুণটি দীর্ঘকাল প্রবলভাবে আছে ইহার হিসাব কে রাখিবে এবং কেই বা জাতি নির্ণয় করিবে? আবার যে হিসাবরক্ষক বা জাতিনির্ণায়ক, তাহারও গুণের হিসাব ও জাতির নির্ণয় কে করিবে? কোন রাজারও

এমন সামর্থ্য নাই যে সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া অর্থব্যয় করিয়াও প্রত্যেকটি লোকের গুণের হিসাব রাখিতে পারে। কারণ ইহা করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের পশ্চাতে একটি করিয়া সাহজ্ঞ গুণনিরূপণে বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিতে হইবে এবং কোন লোকেরও এমন ক্ষমতা নাই যে চব্বিশ ঘণ্টা আহারনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদেরও পাহারা দিতে পারে। সেই পাহারাদারদেরও গুণের হিসাব কে রাখিবে—ইহাও সমস্যা। কারণ তাহাদেরও গুণের পরিবর্ত্তন বশতঃ জাতির পরিবর্ত্তন হইবে। যদি ইহার জন্য বিচারালয় স্থাপন করা যায়, তবে সে বিচারালয়ে বিচারক কে হইবে? কারণ সত্ত্বগুণপ্রধান না হইলে তাহার বিচারে বিশ্বাস করা চলে না। কারণ সে মিথ্যা বলিতে পারে এবং পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে। আবার, বিচারকেরও সত্ত্বাদি গুণের পরিবর্ত্তন হইবে, তখন তাহার বিচার কে করিবে? আবার বিচার চলিতেছে এরূপ অবস্থায় বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই বিবাদ গুণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে. তাহা হইলে বিচারও প্রহসনে পরিণত হইবে। আবার জাতির নির্ণয়ের পূর্ব্বে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আসামীকে কোন্ জাতি বলা হইবে? জাতির নির্ণয় না হইলে সেই অবস্থায় তাহার ধর্ম্মকর্ম্মাদি এবং সামাজিক বিবাহাদি ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? এই সকল অব্যবস্থা ও অনবস্থা দোষের কোন প্রতীকার আছে কি? অতএব জাতি অমূলকই বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

এই প্রবন্ধটি বৃহৎ হওয়ায় কয়েক সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ যদি লেখকের সঙ্গে একমত না হন ও সমালোচনা করিতে চান, তাহা হইলে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তিনি যেন তাহার মন্তব্য করেন।—সম্পাদক

কুম্ভমেলায় ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্তের সাধুসেবা

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী

আমরা ৫ই এপ্রিল (১৯৭৪ ইং) হরিদ্বার কুম্ভমেলার বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায় খালসা কনখলে পৌঁছে দেখি চতুঃসম্প্রদায়ের মহন্তগণ সকলেই কুম্ভমেলায় এসে পৌঁছেন নি। অথচ তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণ অনেকেই এসে পৌঁছে গেছেন। আর সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই 'হরিহর' বিদ্বেষী ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্ত মহারাজ প্রতিবেলার কমপক্ষে পাঁচশ মুক্তি অর্থাৎ দুবেলায় হাজার মুক্তি প্রসাদ পাচ্ছেন। পরিশেষে যদিও সাধুরা খরচ চতুঃসম্প্রদায়ের মহন্তগণই সমান ভাবে বণ্টন করে বহন করার প্রথাই প্রচলিত, তাহলেও মাসাধিক সাধুসেবায় এত বিপুল খরচ কি ভাবে সংকুলান হয় এই অলৌকিক ব্যাপারটি জানবার এক ব্যাকুল আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসল। হাঁ সেটা অলৌকিক বৈ কি? এতৎ সম্পর্কে পরমারাধ্য দাদা গুরুজী শ্রী১০৮স্বামী সত্যদাসজী মহারাজের একটি উক্তি আমার মনে পড়ে। দাদাগুরুজী কুম্ভমেলায় যাবেন। সাধুসেবার জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। কথাটা শিষ্যদের মধ্যে প্রচার হওয়ায় সকলে চাঁদা করে টাকাটা উঠিয়ে দিবেন স্থির করলেন। দাদাগুরুজী একথা শুনে বললেন, একি চাষার ব্যাপার? না হয় তোমরা পাঁচ সাত হাজারই সংগ্রহ করলে। কিন্তু মাসব্যাপী নিত্য বর্দ্ধিত সাধুসেবার জন্য এত কিছুই নয়। এক একটি সাধুর খোরাকের পরিমাণ কত সেটা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। বস্তুতঃ যারা কুম্ভমেলাদিতে গমন ক'রে থাকেন তারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে এ শুধু দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাতের ব্যাপার নহে পরন্তু রাজরাজড়াদের মতই খুব আড়ম্বরপূর্ণ পাকাকলাপের অনুষ্ঠান। পুরি, কচুরি, লাড্ডু, শাক, হালুয়া, মালপো,

পাকৌড়ি, তরৈ প্রভৃতির ঘটা দেখলে অবাক্ হতে হয়। কখনও কখনও সে আয়োজন ও পরিবেশন এত অধিক হয় থাকে যে অর্ধমাইল দীর্ঘ পঙক্তিতে বসে পাত খালি ক'রে উঠা সাধুদের পক্ষেও দুঃসাধ্য। অবশ্য আঞ্চলিক খাদ্যাভ্যাসের অনভ্যস্ত ভক্ত-শিষ্যদের আহারের সুবিধার জন্য ডাল-ভাত ওষুধকারির সুবিধা যে থাকে না তা নয়। কখনও কখনও সাধুসেবা থেকে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত পাকাকলারও পরিবেশন করা হয়। কাজেই ব্যাপারটা যে অলৌকিক সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কৌতূহল নিরসনের জন্য আমি ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব স্থির করলাম।

১১ই এপ্রিল। আজ বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম রামানন্দী সম্প্রদায়ের মহন্ত হস্তী-তুরঙ্গম দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত সাধুদের এক বিরাট মিছিল সহ কুম্ভমেলায় এসে উপনীত হলেন। সঙ্গে সাধুদের একটা তৎপরতা ছিল। তাই কোন এক সময়ে ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজের হুঁকোতল ছিল কিছুটা হালকা। সন্ধ্যাহ্নিক হতেই মহন্তজী আমাদের তাঁবুতে সকলের সুখসাচ্ছন্দ্যের খবরাখবর নিলেন। —কোন কষ্ট হচ্ছে না ত? প্রসাদ পেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? ধর্মনাদি কেমন হচ্ছে ইত্যাদিইত্যাদি। এভাবে মহন্তজী নিত্যই আমাদের খোঁজখবর নেন, আজও নিলেন। আমি এই সুযোগে সাধুসেবার ব্যয় সম্পর্কে আমার মনে যে একটি অনুসন্ধিৎসা রয়েছে সেটি উত্থাপন করলাম। মহন্তজী সব শুনে বললেন, দেখুন, আমি কিছুই জানি না। গুরুই আমাদের ভরসা। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে যাচ্ছেন। যে পরিমাণ সাধুসমাগম হচ্ছে সে পরিমাণ অর্থ কোন না কোন উপায়ে এসে যাচ্ছে। মহন্তজী এতটুকু বলেই চক্ষু নিমীলিত করে রইলেন। আমি ভাবতে লাগলাম বিষয়ামোদীরা সকাল থেকে নৈশভোজ গ্রহণ পর্যন্ত বিষয়ধ্যানে সময় অতিবাহিত করে, তবুও গ্রাসাচ্ছাদন কার্যে তাদের তুষ্টি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু অধিক উপার্জন ও তৎসহ প্রভাব প্রতিপত্তির চিন্তায় তারা নিয়ত ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত একজন মহাত্মা মাসাবধি সহস্র সাধুর আহার্যের দায়িত্বভার বহন করেও সম্পূর্ণ নির্দ্বিগ্ন, বলছেন তিনি কিছুই জানেন না। গুরুই তাঁর সব। ঐশ্বরমনোবাক্যে গুরুতে আত্মসমর্পণ এবং তদীয় নির্দেশিত পথে সাধন ভজনই যে এবম্বিধ শক্তি লাভের উৎস, মহন্তজীর মুখপদ্মনিঃসৃত স্বল্প ভাষণের মধ্যে একথাটিই যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শ্রীগীতায় নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকটি এ যেন প্রতিধ্বনি।—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

অনন্যচিত্ত হয়ে আমার চিন্তা করতে করতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করে থাকি। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধবস্তুর রক্ষণ আমি করে থাকি। গৃহস্থ বাড়ীতে দুচারজনের সমাবেশে যেখানে গৃহস্বামীকে হেঁসেলের হতে হয় সেখানে কৌপিন ও কটিবস্ত্র মাত্র সম্বল একজন মহাত্মা কিভাবে সহস্র সহস্র মুখিকে মাসাবধিকাল সুষ্ঠুভাবে বিবিধ সুস্বাদু আহার্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্তির সহিত আপ্যায়িত করে থাকেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এই চিন্তাপথেই অধ্যাত্ম-শক্তির উৎসের সন্ধানটি পাওয়া যায়। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কিছুদিন পূর্বে শ্রীবৃন্দাবন থেকে আমাকে একখানা পত্র লিখিয়েছিলেন। তার পাঠটী এইরূপ— "সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করবে। তিনি মঙ্গলময়, তিনি সবই দেখছেন ও করবেন।" আমার এ উপদেশটি খুবই ভাল লেগেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকার অভ্যাসটী আজ পর্যন্তও আচরণে আনতে পারিনি।

যা বলছিলাম। গুরুপরম্পরায় সাধনসম্পদই যে এই অলৌকিক শক্তির উৎস সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সত্যদাসজী মহারাজের জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার অন্যতম একটী কাহিনী মনে পড়ল। একবার শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তটে মাসব্যাপী সাধুমেলা আরম্ভ হয়েছে। এই মেলাই পরিশেষে হরিদ্বার কুম্ভে উঠে যায়। এই মেলায়ও ব্রজবিদেহী শ্রীমহন্তকে

উপস্থিত থেকে সাধুসেবার ভার গ্রহণ করতে চান। শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজও মেলায় উপস্থিত থেকে সর্বসাধারণকে দর্শনদান ও সাধুসেবার কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেদিন আশ্রমের ভাঁড়ারে একদানাও অবশিষ্ট ছিলনা। আশ্রমস্থ সাধুগণ অধিকাংশ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। বেশ অধিক হয়ে গিয়েছিল। সাধুসেবার জন্ত রহুইয়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে সন্তদাসজী মহারাজ তাড়াতাড়ি রন্ধনসামগ্রী এনে উপস্থিত করতে আশ্রমস্থ সাধুদের আদেশ করলেন। সাধুগণ ভাঁড়ারের অবস্থা শ্রীগুরুদেবকে জ্ঞাপন করলেও তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে রসদ এনে উপস্থাপিত করার জন্ত সাধুদেরে কেবলি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সাধুগণ মুখ চাওয়া-চায়ি করছেন দেখে বললেন, "বলছি, তোরা যা নারে।" সাধুগণ কি আর করেন? গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁরা আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। সকলের মনেই গভীর নৈরাশ্য। এ লজ্জার অবধি নাই। কিন্তু সাধুগণ আশ্রমের সন্নিকটবর্তী হয়ে সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন বহুসংখ্যক গোশকট বোঝাই বোঝাই আটা, ঘৃত, ডাল ও বিবিধ রন্ধনসামগ্রী নিয়ে কেশবেন নিম্বার্ক আশ্রমের রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। রসদ খালাস করবার কেহ আশ্রমে উপস্থিত নাই। সাধুগণ এই অলৌকিক ঘটনা শ্রীগুরুদেবেরই যে লীলা তাহা প্রত্যক্ষ করে তাড়াতাড়ি রসদ খালাস করার কার্যে লেগে গেলেন এবং অচিরাৎ সাধুসেবার জন্ত আটা, ডাল, ঘৃত ও যাবতীয় রন্ধনসামগ্রী যমুনাতটে সাধুজমায়েতে এনে উপস্থিত করলেন। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তদীয় গুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজের জীবনচরিতে (একত্রে ১ম ও ২য় খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন—এই মহৎ পদের সম্পর্কে বিষয়সম্পদের কিছুই আবশ্যকতা নাই। সাধনসম্পদই ব্রজবিদেহী মহত্বের একমাত্র সম্পদ, ইহা না থাকিলে এই পদে কেহ টিকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের মাহাত্ম্য

(অখিল ভারত শ্রীনিম্বার্কাচার্যপীঠ [সলেমাবাদ] পরিচালিত [১লা ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৬ ইং তারিখে প্রকাশিত] ধর্ম্মীয় পাক্ষিক পত্রিকা "শ্রীনিম্বার্ক" হইতে অনুদিত)

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল

উৎকল দেশের বিখ্যাত কটক শহরে ওলাবরাম মণ্ডলমল নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 'ভারতমাতা গুড্রাক ফ্যাকটী'র মালিক। তাঁহাদের এক বিবাহিতা কন্যা ছিল। ঐ কন্যাটির মৃত্যুর পর তাহার আত্মা কোনও কারণে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূত-যোনি প্রাপ্ত ঐ আত্মা তাহাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা তাহার সখী এক যুবতীভক্তীর উপর উৎপাত করিত ও ভয় দেখাইত। ঐ ভক্তীর বন্ধুবান্ধব এবং ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের পরামর্শানুযায়ী বড় বড় ডাক্তার দ্বারা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করান হইল কিন্তু তাহার কোন সুফল পাওয়া গেল না, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া ডাক্তারগণের এবং অন্যান্য অনেকের পরামর্শে মেয়েটির অভিভাবকেরা কলিকাতা এবং বোম্বাই শহরের বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে তাঁহাদের বহু হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল, কিন্তু রোগ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না, বরং রোগীর অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অবনতি হইতে লাগিল, ইহাতে রোগীর পরিবারস্থ সকলে

হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমতাবস্থায় একদিন ঐ পরলোকগত প্রেতাত্মা ঐ মেয়েটির মুখ দিয়া কহিল, —"তোমার কোন রোগ হয় নাই। সে আমার বোন আমারই জন্য সে কষ্ট পাইতেছে এবং আমি নিজেও কষ্ট পাইতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মের কোন পাপের ফলে আমি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রেতযোনিসুলভ দুঃখভোগ করিতেছি। যতদিন আমার আত্মার মুক্তি না হইবে, ততদিন চিকিৎসা করাইলেও সে আরোগ্য লাভ করিবে না এবং শান্তিও পাইবে না।" তখন রোগিনীর পরিবারস্থ সকলে ঐ পরলোকগত আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইবার এবং সদ্গতিলাভের উপায় কি?" উত্তরে পিশাচযোনি প্রাপ্ত আত্মা কহিল, "শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ" পালনেই আমার মুক্তি, সদ্গতি ও শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণ ব্যতীত আপনারা লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও তাহার রোগমুক্তি হইবে না এবং আমিও প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার পাইব না। অতএব যদি আপনারা চাহেন যে আমার ভগ্নী রোগমুক্ত হউক এবং আমি প্রেতযোনি হইতে মুক্তি ও সদ্গতি লাভ করি, তবে অন্য কোন ব্যবস্থা না করিয়া, অতি সত্বর কোনও সনাতন ধর্ম্মী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আমাদের দুইজনের কল্যাণের নিমিত্ত 'শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ' পালনের আয়োজন করুন।"

মেয়েটির মাতাপিতা, আত্মীয়—স্বজন এবং অন্যান্য বন্ধুগণ ইহাতে সম্মত হইয়া এক সনাতন ধর্ম্মী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ পালন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক পণ্ডিত মহাশয় নিকটে একটি বাঁশ পুঁতিয়া রাখিতে ভুলিয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পালনের শুভ সময়ে একটি বাঁশ ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখা একটি প্রাচীন এবং শাস্ত্রীয় প্রথা। এইরূপ কথিত আছে, যে পরলোকগত আত্মার নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ পালন করা হয়, সেই আত্মা এই বাঁশের উপর উপবেশন করতঃ পাঠ শ্রবণ করে। কোন বাঁশ প্রোথিত না দেখিয়া সেই পরলোকগত আত্মা তাহার ছোট ভগ্নীর শরীরে প্রবেশ করতঃ কহিতে লাগিল,—"আপনারা ত শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিরালম্বসাহে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার জন্য কোন বাঁশ পুঁতিয়া রাখেন নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীনকালে এইরূপ বাঁশের উপর বসিয়া ধুন্ধুকারী নামক এক প্রেত গোকর্ণ নামক তাহার এক ভ্রাতার মুখে সপ্তাহ ব্যাপিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতঃ মুক্তি পাইয়াছিল আমি কোথায় বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পরম পাবন কথা শ্রবণ করতঃ মুক্তি লাভ করিব?"

পরলোকগত আত্মার এই শাস্ত্রোক্ত কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই ত্রুটি স্বীকার করতঃ বাঁশ আনাইয়া পাঠস্থলে প্রোথিত করিলেন। বাঁশ পুঁতিলেও বাঁশটিকে কাপড় দিয়া মোড়াইতে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। পরলোকগত আত্মা সত্বর তাহার দুহিতার কনীয়ান শরীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনারা এই বাঁশটিতে কাপড় দিয়া মোড়ান নাই,—এই নগ্ন বাঁশের উপর বসিতে আমার কষ্ট হইবে। আপনারা বাঁশটি এখনই কাপড় দিয়া মোড়াইয়া দিন, যাহাতে আমি বসিয়া শান্তিতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করিতে পারি।" ঐ মেয়েটির পরিবারস্থ লোকজন এই ত্রুটির জন্য পরলোকগত আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সত্বর একখানি কাপড় দিয়া বাঁশটিকে মোড়াইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে এই খবর চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল এবং সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সপ্তাহব্যাপী এই শ্রীমদ্ভাগবত কথা এবং জীবিত ব্যক্তির মুখে পরলোকগত আত্মার কথা শ্রবণ করিবার জন্য হাজার হাজার লোক, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে, উপস্থিত হইল এই আশ্চর্য্যজনক সত্য ঘটনা হইতে জন্মান্তরবাদ, পুরাণ এবং বেদশাস্ত্রের উপর জনগণের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল।

পরিশেষে সেই পরলোকগত আত্মা তাহার ভ্রাতা ও মাতাকে কহিল—"আমার পিতৃদেবের মুক্তি হয় নাই। কারণ আজকালকার লোকগণ পিতামাতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লয় কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা তাঁহাদের শ্রাদ্ধতর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন এবং দানপুণ্যাদি

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বিধানমত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত করে না। এই কারণে তাহাদের মাতাপিতার আত্মার অধোগতি হয়। অতএব আমাদের পিতৃদেবের মুক্তির জন্য সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ পালন করা কর্ত্তব্য। তবেই পিতৃদেবের মুক্তি ও সদ্গতি হইবে নতুবা নহে।"

এই সব ঘটনা শুনিয়া কলিকাতা হইতে ঐ পরলোকগত আত্মার যজমানও ঐ শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহোপলক্ষে পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ আত্মা তাঁহার পুরতাত-তনয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়া যজমানা ঠাকুরাণীকে কহিল,— "শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহ পালনের যাবতীয় ব্যয় ভার আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকদেরই বহন করা উচিত, কারণ মৃত্যুর পর বিবাহিতা স্ত্রীর যাবতীয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দায়িত্ব শ্বশুর বাড়ীর লোকদের উপরই বর্ত্তে, কন্যার মাতা পিতা কিংবা ভাই বন্ধুর উপর নহে। অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহের ব্যয় যদি আপনি বহন না করেন এবং আমার মাতা ও ভাই বহন করেন, তবে আমার মুক্তি কিংবা সদ্গতি হইবে না।"

যজমানা ঠাকুরাণী ইহা শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতসপ্তাহের ব্যয় ভার বহন করিতে সানন্দে সম্মত হইলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহব্যাপী শ্রবণ করিলেন। ইহাতে ঐ পরলোকগত আত্মার সদ্গতি হইল, তাহার পুরতাততনয়ও সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তাহার সমস্ত রোগ চিরদিনের জন্য সারিয়া গেল। পরিবারস্থ লোকজনও আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। *

এই সত্য ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়বে, আমাদের শাস্ত্রপুরাণের সমস্ত বাক্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সব বাক্যের উপর ক্ষণকালের জন্যও সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। আশা করি পাঠকগণ সনাতন ধর্ম্মের প্রাণ এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবেন এবং ইহার নির্দ্দেশিত পথে চলিয়া স্বীয় সনাতন ধর্ম্মকে অবলম্বন করতঃ নিজের, নিজ কুলের এবং দেশের পরম কল্যাণ সাধন করিবেন।

সনাতন ধর্ম্ম কি জয়।

---

*পরম পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য গোবর্দ্ধন-পীঠাধীশ্বর শ্রীস্বামী নিরঞ্জনদেবতীর্থজী মহারাজ কথিত একটি সত্য ঘটনা।

স্মৃতিচারণ

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়, এম. এ

১৩৭৯ বাং ১৩ই ফাল্গুন বিকেল ৪টায় গাড়ীতে বাবাকে নিয়ে চলেছি বহড়ায়। শ্রীভোলানন্দমঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রধানন্দজী কেমন আছেন?" বল্লাম, "বাবা, প্রধানন্দজী এখন বারাকপুরে আছেন, ভালই আছেন।"

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজের সাক্ষাৎ সাধুশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী প্রধানন্দগিরি মহারাজ সুযোগ্য উত্তর সূরী, অধ্যাত্মজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিগত দিন এই স্থূল দেহ ত্যাগ করেছেন। সুখচরন কাঠিয়া বাবার আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে ধর্ম্মসম্মেলন হয়েছিল তাতে এই মহাপুরুষ সভাপতিত্ব করেছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও তিনি অতি সাধারণ সাধুজীবন যাপন করতেন। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজের সাথে তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। তাঁর আশ্রমে দুর্গাপূজার সময় বাবা সুযোগ আশ্রমে থাকলে পায়ে হেঁটে বেয়ে দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করতেন। অষ্টমী পূজার দিন ফলমূল ও উপকরণ পাঠাতেন। বাবা একবার একখানা খুব দামী গরদের

কাপড় ব্রহ্মানন্দজীকে পাঠিয়ে দেন। বাবার স্বশুরের আশ্রমে অবস্থান কালে ব্রহ্মানন্দজী প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা করতেন।

শ্রীশ্রীভোলানন্দপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীভোলানন্দচরিতামৃত (ইং ও বাং) গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থটি নিজে হাতে আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। বাবার শিষ্য শিষ্যাদের পরিচয় পেলে খুব আদর করতেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর আশ্রমে কিছুদিন ভাগবত পাঠ করেছিলাম। তাঁর সামনে গেলেই, 'এই যে ভাগবতরত্ন এস' বলে সম্বোধন করতেন।

কতবার তাঁর কাছে গিয়েছি। প্রতিবারই কিছু না কিছু উপদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করেছি। একবার বলেন, "শিষ্যের চাইতেও আমি ভক্তকে বেশী ভালবাসি। তোমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মূল ভাবটি কিন্তু এক —ত্যাগ আর নামজপ।" একদিন বলেন, "কর্মই এই ও মুখদুঃখের কারণ।" তাঁর সামনে নামকীর্তন অথবা ভক্তিমূলক সঙ্গীত হলে দেখতাম তাঁর বুকের মধ্যে সহজ ভাবেই ধ্বনিতরঙ্গ উঠা নামা করছে। সবার কাছেই তিনি খুব আপনজন ছিলেন। ঘরোয়া কথাবার্তা ও উপদেশ দান এ সবের মধ্যেও মনে হত তিনি এক অন্য জগতের মানুষ, এ জগতকে যেন বসে বসে শুধু দেখছেন। একটা আত্মসমাহিত ভাব সব সময় তাঁর মুখে বিরাজ করত।

অন্তর্ধানের কিছুদিন পূর্বে গঙ্গার মাহাত্ম্য শোনালেন। তখন বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর প্রশান্ত নশ্বর দেহ মা গঙ্গা দুই হাতে কোলে তুলে নিয়েছেন। মহাপুরুষের মনো লোকের খবর কে পেয়েছে জানি না— আমরা শুধু সেই কথাটিই উচ্চারণ করতে পারি, "বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।"

গীতোক্ত

শ্রীভগবদবতার তত্ত্ব ও বিশ্বরূপদর্শন

শ্রীধর্মদাস দাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

সচ্চিদানন্দ পুরুষ যেহেতু দেহধারণ করিতে পারেন, তবে কেন ও কি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তিনি পরবর্তী ৭।৮ শ্লোকে অর্জুনকে বলিতেছেন :—

হে ভারত, যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ ধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হই। ৭

সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

তাৎপর্য এই যে অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তি ধর্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম, ইন্দ্রিয়দমনাদি নিবৃত্তি ধর্ম ও ভগবদ্ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপাদের ধর্মধারা যখন ক্ষীণবল হইয়া আসে এবং পাপাচার ও পাপবুদ্ধি হইতে থাকে, তখনই ভগবান্ নিজেকে মায়া প্রভাবে নিত্য শুদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধু ও দুষ্কৃত বলিতে মনে যে সহজ উপলব্ধি আসে তাহা হইল এই যে, যাহারা বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্মত্যাগ করেন না, তাহারাই সাধু; আর যাহারা বিষয় বিলাসে উন্মত্ত ও দুর্বুদ্ধিদোষে অভিভূত হয় ও ধর্মনিষিদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই দুষ্কৃত বলিয়া খ্যাত। অতএব সাধুদিগের

স্বরূপ এবং দুষ্কৃতদলকে দমন, এবম্প্রকারে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রকৃত কারণ।

ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্দঘন স্বরূপ। তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজমায়া-কল্পিত দেহ ধারণ করতঃ জন্মমরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হয়েন ও বেদবিহিত ধর্মের স্থাপন পূর্ব্বক সংসার রক্ষার জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্তই অলৌকিক।

ভগবান্‌কে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠান রত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে যিনি স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। উহাই নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য।

তারপর, একনিষ্ঠ ভক্তগণের উদ্দেশে তিনি বলেন যে মুমুক্ষুগণ কেবল ভগবৎ স্বরূপেরই আরাধনা করেন, তাই তাহারা অন্তে মুক্তিপদ ব্রহ্মপদ লাভ করেন ভগবানের স্বরূপ তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং মুক্তিদাতা, তবে জীব তাঁহাকে আরাধনা করতঃ মুক্তিলাভ কেন চায় না—তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে আরাধনা করার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকের অবতারণা করেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্। ৭।২৪

অবিবেকিগণ, (যাঁহাদের বুদ্ধি সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই) আমার অব্যয়, অনুপম উৎকৃষ্ট পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া প্রপঞ্চাতীত আমাকে লীলাবিগ্রহ ধারণ অবস্থাতেই পর্য্যবসিত মনে করে, সেইজন্যই আমার শরণাগত না হইয়া অন্যদেবতাকে ভজনা করে।

ভগবান্ বলিতেছেন যে যাহারা বিবেকবুদ্ধি বঞ্চিত, তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বকারণের কারণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ-ঘন না জানিয়া অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ংই যে অবতাররূপে ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার মৃত মীন, কূর্ম্ম মানবাদি দেহ সর্ব্বস্ব জীব বলিয়া জ্ঞান করে। তাই তাহারা তাঁহার স্বরূপে বিমুখ হইয়া অন্য দেবতার আরাধনা করেন এবং এই জন্যই তাহারা ক্ষণবিধ্বংসী ফল প্রাপ্ত হন।

একই বাণী তিনি রাজযোগে (নবমোঽধ্যায়ে) অন্যরূপ ভক্ত ও বিদ্বেষীকে অবহিত করিতেছেন :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্। ৯।১১

অন্বয়ার্থ—অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূত মহেশ্বরস্বরূপ আমার পরমভাব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী বলিয়া আমার অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ১১

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য নিজ মায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণক্রমে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। কিন্তু মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিকরূপ ও লীলাতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণাদিকে সাধারণ মনুষ্য বোধে অনাদর করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী সাধকগণ সেই চিদানন্দ মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে মনুষ্যবেশে অবস্থান করিলেও, তিনি যে সমস্ত প্রাণীর একমাত্র অধীশ্বর, এই সত্য তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবদুক্ত বিভূতিযোগ শ্রবণকরতঃ অর্জ্জুন বলিলেন, 'তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্তস্বরূপে বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ, আমার একান্ত ইচ্ছা আমি তোমার সেই ঐশ্বরিকরূপ দর্শন করি, কিন্তু দিব্যচক্ষু ও দিব্যানুভূতি ব্যতিরেকে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা,
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ১১।৮

হে অর্জ্জুন; তুমি তোমার এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমার এই দিব্যরূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এইজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দেখ।

অর্জ্জুন দিব্যচক্ষুলাভ করায় পর ঈশ্বরের যে ঐশ্বরিক রূপ তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল, তাহা ভগবানের

বাইবেলে প্রকাশ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥১১॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

ভক্তের অধীন ভগবান্ তাই শিষ্যের একান্ত প্রার্থনায় ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্যময়রূপ ভক্তের কাছে প্রকাশ করিলেন। ভগবদ্বাক্যে যাহার অটুট বিশ্বাস, ভগবানে যাহার একান্ত ভক্তি, ভগবদ্ভীতি যাহার আর কিছুই ভাবনা নাই; সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ, তাহাকেই আত্মরূপ দর্শন করান। বিশ্বাসের বৈদগ্ধ্যে ও প্রেমের মাধুর্যে যে পরমৈশ্বর্যময় অলৌকিক রূপের প্রকাশ যাহা (ভগবানের উক্তিতে)

'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন,

—সেইরূপ একান্ত ভক্ত ও শিষ্য অর্জুন নিরীক্ষণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

ভ্রমসংশোধন—এই প্রবন্ধে পৌষ-মাঘ সংখ্যায় ৬১ পৃষ্ঠায় ৪র্থ অঃ ৯ম শ্লোকের প্রথম লাইন "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং" যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" ইহার পর ২য় লাইন "ত্যক্ত্বা দেহং—" ইত্যাদি পড়িতে হইবে।

আশ্রম পরিক্রমা

(তৃতীয়পর্ব)

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

একদিন প্রসাদ নেওয়ার ডাকে ঠাকুরজীর ঘর থেকে নীচে নেমে এলাম। নীচে প্রশস্ত স্নান বাঁধানো উঠান। শিশু, নারী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সকলেই পাশাপাশি বসে গেলেন, এখানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই, নেই ধনী দারিদ্রের বৈষম্য, কারণ সকলেই ঠাকুরজীর সন্তান।

আশ্রমবাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী এবং মহারাজগণ এগিয়ে এলেন পরিবেশন করতে অন্ন, ডাল, তরকারী, চাটনী, পায়েস—সবই ঠাকুর জীর প্রসাদ। পরিবেশন শেষ হলে ঠাকুরজীর প্রার্থনা গান হ'ল, ধ্বনি দেওয়া হ'ল। তারপর প্রসাদে হাত দেওয়া হ'ল। সামান্য ডাল, ভাত, তরকারী তবু যেন অমৃত। প্রসাদ নেওয়া শেষ হলে পাত্র ত্যাগ করবার পূর্বে আবার ধ্বনি দেওয়া হ'ল। সবার প্রসাদ গ্রহণ শেষ হলে উঠান পরিষ্কার করা হল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আচার নিষ্ঠার যেন জীবন্ত বিগ্রহ সমস্ত আশ্রম টাটী।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রসাদ গ্রহণান্তর আশ্রমেরই একখানা ঘরে কিছু সময় বিশ্রাম করে, ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখতে দেখতে ওপর তলায় এসে উপস্থিত হ'লাম বহস্ত মহারাজের ঘরে। অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাত্রা, সদাহাস্য মুখ। প্রণাম করে তাঁর কাছে বেশ খানিকক্ষণ বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে ঠাকুরজীর মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। কিন্তু আমি অপেক্ষা করে চিরবাঞ্ছিত ঠাকুর-জীর আরতি দর্শন করতে পারলাম না—সংসারের স্থূল কর্তব্যের হাত ইশারায়। ঠাকুরজীর মন্দিরে এসে প্রণাম করে, নেমে এলাম।

দেখলাম আশ্রম জীবন বড়ই কঠোর। এখানে আরাম বলে কিছু নেই। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শুধু ঠাকুরজীর নিয়মাদিই কাজ করতে হয়। এ আশ্রমে ঠাকুরজীই প্রভু আর সকলে তাঁর দাস। প্রথম থেকে বলতে গেলে একটি হিন্দী কবিতার কথা মনে পড়ে।

"পহেলা পহর মে সব কোই জাগে।
দোসরা পহর মে ভোগী।
তিসরা পহর মে তস্কর জাগে।
চৌথা পহর মে যোগী ॥"

রাত তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে প্রত্যেকটি আশ্রমবাসীকে শয্যাত্যাগ করে উঠতে হয়। তারপর প্রাতঃ-কৃত্যাদি শেষ করে আশ্রম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ঠাকুরজীর সেবাপরিচর্যা, ভোগ তৈরী করা ইত্যাদি কাজে এগিয়ে যেতে হয়।

যদিও নারী শিক্ষা এবং ভক্ত এ আশ্রমে দর্শন অভিলাষে এসে থাকেন তবুও রাত্রিতে নারীগণের আশ্রমে থাকবার বিধান নেই।

প্রতিটি কাজেই নিষ্ঠা এবং ভক্তিই প্রধান অঙ্গ। প্রেম ও জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তিও এই সম্প্রদায়ের উপাসনার পথ। প্রসঙ্গতঃ কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ রচনায় প্রেমনিষ্ঠা ভক্তিই অর্ঘ্য দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে। তিনি ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই একাধারে সাধক ভক্ত কবি। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য প্রেম ভক্তি দিয়ে সারাজীবন সাধনা করেছেন মীরাবাঈও। আবার দাস্য ভাবে সাধনই এ সম্প্র-দায়ের মুখ্য সাধন পথ। সখ্য ও বাৎসল্য ভাবেও কেউ বা সাধনা করেছেন। কিন্তু কোথাও জ্ঞান বা নিষ্ঠা বা প্রেম ব্যাহত হয় নি। এ তিনের মিশ্রণে সাধনাতেই সাধকহৃদয়ের প্রদীপ যখন জ্বলে ওঠে, তখনই তিনি হ'ন আপ্তকাম। তখনই কাম রূপান্তরিত হয় প্রেমে; ক্রোধ লোভ মোহ ও মাৎসর্য্য সবেরই রূপান্তর ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় দাস্যাদি ভাবের সঙ্গে নিষ্কাম প্রেমই সাধনার সোপান, কারণ অনন্ত প্রেমময়ই যে

হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাধনা বড়ই কঠিন সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্তির জন্যে যেমন শ্রীরাধা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা, চোখের জল ফেলে তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পেয়েছিলেন, তেমনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যপরম্পরা শ্রীরাধার মতই তাঁর সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পেতেই যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছায়া, যেমনভাবে পুড়িয়ে ধূপ তৈরী হবে, করতে হবে পূজার আয়োজন। নিষ্ঠা ও ভক্তির সাথে মনো ও প্রেম না থাকলে বৈষ্ণব সাধনার সার্থকতা আসে

কল্পনা চাই প্রেমেরই রস উদ্ভাবনী ভাব, কর্ম চাই মনোময় প্রতিক্রিয়া, প্রেমকে অবলম্বন করে সত্যপথে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় চলা। আর প্রেম চক্ষু প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরকে দর্শন করা। তাঁকে পাওয়ার আকুলতা থাকা চাই, তবেই তিনি ভক্তের নিকট ধরা দেন—ভক্ত যদি এক পা এগুতে পারে তিনি এগিয়ে আসেন দশ হাত।

আশ্রম প্রাঙ্গনের পশ্চিম পাশ ধরে প্রবাহিতা মা গঙ্গা। সদ্য জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো পড়েছে প্রবহমান দক্ষিণাভিমুখী স্রোতধারার ওপর। মনে পড়ল পল্লীকবির একটি চরণ —নদী কি "সই থাকতে পারে সাগর যখন টানে!" ঐ আনন্দময় অবস্থা থেকে বিদায় নিয়ে আসতে মন চাইছিল না। মনে হল স্বর্গ থেকে যেন বিদায় নিয়ে চলে আসলাম হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষার, মর্ত্যধামে।

ধনঞ্জয় ভজন

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার সরকার

(মিশ্র আশাবরী, কাহারবা)

আনন্দঘন ভগবান্,
আনন্দ সেবা করে দান।
সন্ত-পুত্র দাস ধনঞ্জয়,
মিলে সাথে ঘরেছে সমান!

কৃপাধারা বিগলিত,
ঝরিতেছে অবিরত
জ্ঞানে-প্রেমে চুলুচুলু,
কৃপা সিন্ধু ও দুটি নয়ান।

শিরোপরি শোভে জটা,
কপালে তিলকছটা,
ভাগবতী তনু নেহারিয়া,
শান্ত হয় ক্ষুব্ধ মন-প্রাণ!

সমাহিত আত্মভোলা,
বাণীতে অমৃত ঢালা,
নরদেহে মূর্ত্ত দিবা প্রেম,
তাই এত লাগে মনে টান—
ওগো মোর গুরু ভগবান!

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সংবাদ

শিলচরে কাছিয়া বাবার আশ্রমে আগামী ১১।৩।৭৬ তারিখে শ্রীশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে, পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ আগামী ৫।৩।৭৬ তারিখে শিলচরে যাইবেন।

MENDED-2008

সাময়িকী

১। বাসুদেব পত্রিকার আজীবন গ্রাহক

গত ২৪শে জানুয়ারী '৭৬, সুখচর "কাঠিয়া বাবার আশ্রম"-এ শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী সেবকসংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে গুরুভ্রাতা শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষ প্রস্তাব করেন যে এককালে ১০০ (এক শত) টাকা চাঁদা দিয়া বাসুদেব পত্রিকার আজীবন গ্রাহক হইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আজীবন গ্রাহকদের এককালে দেয় চাঁদা ১০০ টাকা বাসুদেবের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধকুমার পাল মহাশয়ের নিকট "কাঠিয়া বাবার আশ্রম", পোষ্ট সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। আজীবন গ্রাহকগণকে পত্রিকার জন্য বার্ষিক চাঁদা আলাদা দিতে হইবে না এবং পত্রিকাও যথারীতি তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে। আমরা আমাদের সহৃদয় গুরুভ্রাতা-ভগিনী ও পাঠকবর্গকে আজীবন গ্রাহক হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট হইতে ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছা পাইয়াছি।

২। সুখচর আশ্রমে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী গত নভেম্বর মাসে আমাদের সুখচর আশ্রমে পদার্পণ করিয়া সামগ্রিকভাবে আশ্রমটি পরিদর্শন করেন। তাঁহার করকমলে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কর্তৃক লিখিত "সঙ্কর্ষণতত্ত্বদীপ" গ্রন্থটি প্রদান করা হয়। তদনন্তর তিনি বাবাজী মহারাজকে বোলপুর হইতে ৩৯।৮২ বাং তারিখে যে পত্র দেন তাহারই অংশ বিশেষ নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

"শ্রীশ্রীভগবদ্ বিগ্রহেষু,

বাবা কেমন আছেন? মার কৃপাবাবার স্বস্তি হবেন।

সেদিন সুখচর কাঠিয়া বাবার আশ্রমে গিয়াছিলাম আশ্রমের পরিবেশ বড় সুন্দর

'সঙ্কর্ষণতত্ত্বদীপ' নামক গ্রন্থরত্নখানি শ্রীমৎ সদ্গুরু বাবাজী মহারাজের কৃপায় যে যে আধিভূত হয়েছে তার অতি প্রয়োজন হয়েছিল, ঠাকুর পূরণ করলেন খুব আনন্দিত হলাম।

মঙ্গল

আপনার শ্রীসীতারামদাস"

সম্প্রতি সুখচর আশ্রমে শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন

৩। সুখচর আশ্রমে কাঠিয়া বাবার তিরোভাব উৎস

গত ১ লা মাঘ সুখচর আশ্রমে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবা মহারাজের উপস্থিতিতে পরমপূজ্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবার তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয় প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর শ্রীঅনিরুদ্ধদাসজী মঙ্গলগীতি গাহিয়া উৎসবের সূচনা করেন। বেলা ৯টায় আশ্রমে নাট মন্দিরে শ্রীরামদাসজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া পরস্পর আলোচনা করেন গুরুভ্রাতা শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়। ইহার পর শ্রীঅমলচন্দ্র মুখার্জী শ্রীশান্তিরঞ্জন দে ও শ্রীঅজিত নাথ ভক্তের পরিচালনায় নাম কীর্তন শুরু হয়।

নামকীর্তনের পর পূজ্যপাদ গায়ক ও সন্ন্যাসী পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শিবানন্দ গিরিজী তাঁহার দুই শিষ্যবৃন্দের সহায়তায় নামকীর্তন ও বিভিন্ন ভক্তিমূলক মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া বাবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গীত আসরে শ্রী বাবাজী মহারাজ স্বয়ং ও স্বামী জ্যোতির্ধানন্দ গিরি উপস্থিত ছিলেন।

পূজ্যপাদ সোহিত শ্রীশ্রীরামদাসজীর বিরহী কাঠিয়া বাবা ও দাদাগুরুজীর বিশেষ সেবাপূজা